২৪ মার্চ ২০১৩

সুকুমার রায় ২০১৩

ঈশা পালের গল্প । ঋতব্রত ভট্টাচার্য ও স্বাতী গুহর ধারাবাহিক

Green escapE

An Eco Tourism gateway

Upcoming near Budge Budge Khejurtola
(22 km from Taratola)

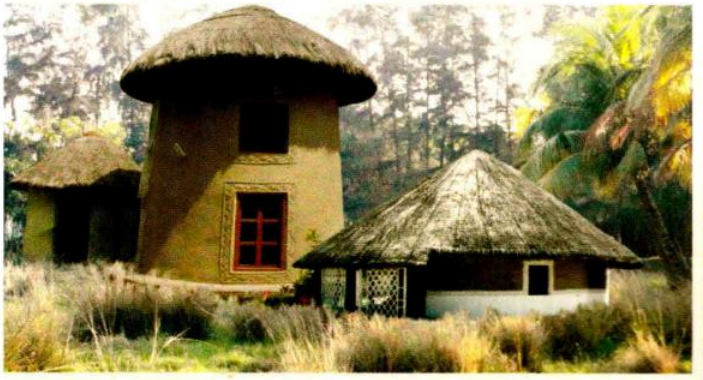

Use Of Solar Power And Lanterns

Surrounded by lush green serene environment

an ideal location for a day out or weekend night halt

For Details Contact : 033 24604536, +913364510400

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

২৪ মার্চ ২০১৩ । বর্ষ ২। সংখ্যা ৭

প্রচ্ছদ ৫

সুকুমার রায় ২০১৩

সুকুমার রায়ের নামটির পাশে যখন ২০১৩ সাল বসানো হয়, তার মানে কী দাঁড়ায়? সহজ মানে। এই সময়ের সুকুমার রায়। এইবারের রবি সেই সুকুমার রায়ের রচনার কিছু নতুন পাঠ। লিখেছেন—

অভীক মজুমদার, প্রশান্ত মাজী
অংশুমান কর ও গৌর বৈরাগী

গল্প ২৮

শুভলগ্ন
ঈশা পাল

ধারাবাহিক ৩৩

বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

কবিতা ৩৮
শ্বেতা চক্রবর্তী, মীর আজিজুর রহমান, অতনু ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ মণ্ডল

নভেলেট ৪০

চিহ্ন
স্বাতী গুহ

নিয়মিত বিভাগ

উদাসী বাবার আখড়া ৪৪
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

আরব্য রজনী ৪৮

প্রচ্ছদ: সুদীপ্ত দে

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** । সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

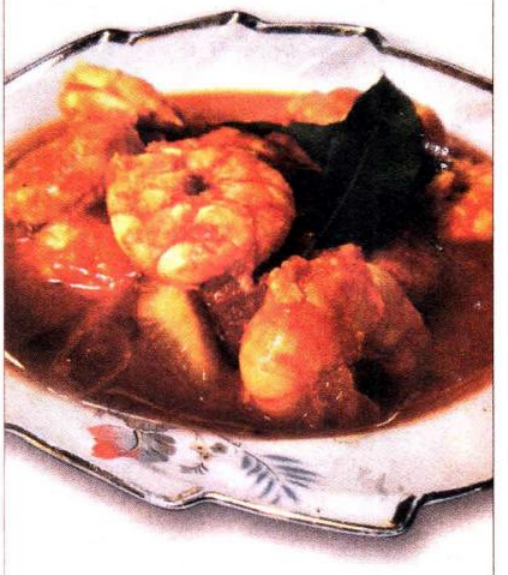

গোটা মশলার স্বাদ এখন গুঁড়ো মশলায়

রান্নার আসল আস্বাদ পেতে এখন আর গোটা মশলার প্রয়োজন নেই। টেস্ট মী গুঁড়ো মশলা তৈরী বাছাই করা খাঁটি মশলা দিয়ে যা প্রতিটি রান্নায় নিয়ে আসে লাজবাব্ টেস্ট। আপনার কিচেনে নিয়ে আসুন টেস্ট মী আর দেখুন রসনায় কিভাবে আসে জাদুর ছোঁয়া।

Taste me..
গুঁড়ো মশলা

A product of

Rose Valley™
Happiness Unlimited

Corporate Office: Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5, Block - DP
Sector - V, Kolkata - 700 091
Ph.: 033 - 4025 4025, 4025 4444, 4025 4000
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries, call: +91 91633 24060

megaminds.in

বোলোগনা, বাংলা সাহিত্য ও শ্লীলতাহানি

রোমানরা গায়ের জোরে স্যাবাইনার মেয়েদের লুট করে আনে। এবং শস্য বা সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের প্রতিবাদেই ১৭০০ বছর পর পৃথিবীর বিখ্যাত ভাস্কর বোলোগনা একটি অনন্য ভাস্কর্য তৈরি করেন।

১০ মার্চ 'রবি'র প্রচ্ছদকাহিনি 'শিল্প ও সাহিত্যের ধর্ষণ' ভারতবর্ষের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বকে নির্দেশ করে। যদিও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল। যা এবারের 'রবি'টিতে ছিল না। কিন্তু শাওনী চক্রবর্তী ও রাহুল দাশগুপ্তের লেখা দুটি ধর্ষণ ও নারীর যৌন নিগ্রহের দুটি দিককে আলাদা আলাদাভাবে তুলে আনে। শাওনীর লেখায় নৃশংস রোমান 'হিরোইক রেপিস্ট'দের ঘটনা শুনে শুধু ঘৃণা নয় ভয়েরও উদ্রেক করে একজন সভ্য সামাজিক মানুষ হিসেবে। ঘটানাটি ঘটেছিল নাকি ৭৫০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দে। সে সময় রোমের মূল অধিবাসী স্যাবাইনারা রোমানদের বিরুদ্ধে নানারকম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যার মধ্যে একটি, নিজেদের মেয়েদের সঙ্গে রোমানদের বিবাহ দেওয়া হবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জন্য রোমানরা গায়ের জোরে স্যাবাইনার মেয়েদের লুট করে আনে। এবং শস্য বা সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। যেহেতু সেই মেয়েরা রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাই যে কেউ ভোগ করতে পারত তাদের। এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের প্রতিবাদেই ১৭০০ বছর পর ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত ভাস্কর বোলোগনা একটি অনন্য ভাস্কর্য তৈরি করেন। রাহুল দাশগুপ্তের লেখায় ধর্ষণ সংক্রান্ত কোনও সামাজিক আলোকপাত না থাকলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস থেকে তুলে এনে নারী নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ এবং সর্বপরি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

অমূল্য প্রধান। তমলুক। মেদিনীপুর।

রবির 'আলোচনা' সবার সেরা

সাম্প্রতিককালের বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলির নিরিখে 'রবি'র 'আলোচনা' (পুস্তক সমালোচনা) বিভাগটি আমার কাছে সেরা মনে হয়। এই সময়ের গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু গ্রন্থের খোঁজ পেয়েছি আমি 'আলোচনা' থেকে। এমন কিছু বই যা ব্যতিক্রমী কিন্তু প্রয়োজনীয়। শুধু গ্রন্থগুলির গুরুত্বই নয় তাদের আলোচনাগুলিও গভীর, মননশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলোচকের কলমের লেখা। বিভিন্ন সময় বিখ্যাত, অখ্যাত, প্রবীন কিংবা নবীন— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সুবোধ সরকারের মতো সুসমালোচকদের যেমন পেয়েছি। তেমনি পেয়েছি সুদীপ চক্রবর্তী, অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় বা সম্পা ভট্টাচার্যদের মতো নতুনদের। সাম্প্রতিক ৩ মার্চ সংখ্যাও তার ব্যাতিক্রম নয়। এদিন মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন আবদুশ শুকুরের 'রবীন্দ্রনাথও মানুষ ছিলেন' বইটিকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি আলোচনা দক্ষতার সঙ্গে সামলানো হয়েছে। মুনমুন এক জায়গায় বলছেন, "প্রেম-মৃত্যু-মুক্তি বা আনন্দ সম্পর্কিত তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ভাবনা তত্ত্বের মোড়কে আবৃত হয়ে সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্যতার পথটি সঙ্কীর্ণ করেছে। তবে তাঁর কবিতা 'বিচিত্রগামী' হলেও যে সর্বত্রগামী হয়নি, তা তো রবীন্দ্রনাথেরও অজানা ছিল না!" এমন অনেক বিশ্লেষণ ও বিচারে ভারসাম্য পেয়েছে মুনমুনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ আলোচনাটি। বর্তমান সংখ্যাটিতে ছিল 'বিদ্যাসগার: নানা প্রসঙ্গ' বইটি। যে বইয়ের আলোচনা করেছিলেন সুদীপ চক্রবর্তী। তাঁর বিদ্যাসগর সম্পর্কিত শেষ বক্তব্যটি 'বৌদ্ধিক চর্চার বিকাশ'। কথাটি প্রণিধানযোগ্য।

সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর। হুগলি

রোজ কত কী'-তে ফিরে পেলাম গুরুকে

'রোজ কত কী'-তে 'গুরুচরিত' বেশ গুরুত্ব সহকারে পড়তে বাধ্য হলাম। কারণ প্রতিবেদনটি পড়ার আগে মহানায়ক উত্তমকুমার সেই মহানায়কোচিত ছবিটি দেখেই বুঝে যাই যে প্রতিবেদনে কোন গুরুর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আর একথা যে কোনও চলচ্চিত্রপ্রেমী বাঙালি একবাক্যে স্বীকার করবেন যে বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে উত্তমকুমার তার ভক্তদের কাছে শুধুমাত্র গুরু নন একমাত্র মহাগুরুও বটে। এরকম একক কৃতিত্বে নিজস্ব ক্ষেত্রে যুগের পর যুগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন কর্তৃত্ব করার নজির জানি না আর আছে কী না! বাস্তবিকই একটা জাতির একটা সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে আপন প্রতিভায় এমন অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধ করতে বিনোদনের দুনিয়ায় আর ক'জন পেরেছেন? তাই আজও সিনেমাপাগল বাঙালির কাছে অদ্বিতীয় উত্তমই প্রথম ও শেষ কথা। হয়তো বাংলা ছবিতে বিভিন্ন সময়ে অনেক স্বনামধন্য অভিনেতা দাপটে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু উত্তমকুমারের মতো চিরকাল ঈর্ষণীয় ভঙ্গিতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করতে কেউ পারেননি। অতএব তাঁর অকালে চলে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্র মহলকে কীভাবে নিঃস্ব করেছে তা বাঙালি দর্শক মাত্রই জানেন! শ্রদ্ধেয় সুব্রতবাবু প্রতিবেদনে মহানায়কের মহাপ্রস্থানের যে মর্মভেদি দৃশ্য চিত্রিত করেছেন তা অতীত বিলাসী বাঙালির স্মৃতিতে সত্যিই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেবাশিস হাজরা। খুরুট। হাওড়া।

সুকুমার রায় ২০১৩

সুকুমার রায়ের নামটির পাশে যখন ২০১৩ সাল বসানো হয়, তার মানে কী দাঁড়ায়? সহজ মানে। এই সময়ের সুকুমার রায়। অর্থাৎ তিনি যদি এই ২০১৩ সালে থাকতেন তবে কী লিখতেন? কীভাবে লিখতেন? এই নিয়ে বিস্তর বিতন্ডা হতে পারে কিন্তু আসল কথা হল আজ থেকে একশো বছর আগে ওই ভদ্রলোক যা লিখে গিয়েছিলেন তা আজ লিখলেও একই রকম হত। তাঁর প্রতিটি রচনা ঠিক এতটাই আধুনিক এবং এতটাই চিরকালের। এইবারের রবি সেই সুকুমার রায়ের রচনার কিছু নতুন পাঠ। ২০১৩ সালে দাঁড়িয়ে তাঁর লেখাকে এখনকার দৃষ্টিতে নতুন করে আবিষ্কার করা। তাঁর রচনায় আপাত হাস্যরসের আড়ালে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য, ভন্ডামি, চ্যুতির প্রতি যে নিদারুন বিদ্রুপ, শ্লেষ, ব্যাঙ্গ রয়েছে তা একমাত্র তিনিই পারেন। তাই সুকুমারের বিকল্প একমাত্র সুকুমার।

আবোল তাবোল

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব্হীন।
আজ্গুবি চাল্ বেঠিক বেতাল
মাত্বি মাতাল রঙ্গেতে–
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।।

গোঁফ চুরি

হেড্ আফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্ত?
দিব্যি ছিলেন খোস্মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে!
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্টি ক'রে গোল
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল"!
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে , কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে,"কাম্ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক কর্ছে ঘোরাঘুরি–
বাবু হাঁকেন,"ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি"!
গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়াত তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্নে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফত রাখ্ত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস কর্ব তোদের জবাই"–
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়–
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
"মুখ্গুলোর মুন্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার– গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতি নির্মম বিদ্রুপ

অভীক মজুমদার

১৯২৯ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোতে আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন আঁদ্রে ব্রেতঁ। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে তাঁকে তিন-তিনবার বেশ কয়েক ঘণ্টা করে জেরা করা হয়। তাঁকে বলা হয় প্রমাণ করতে যে, সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন কোনও কমিউনিস্ট বিরোধী প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন নয়। শেষে তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়, 'শুধুমাত্র পরিসংখ্যান' নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর একটি প্রবন্ধ লিখতে। ব্রেতঁ লিখতে অস্বীকার করেন। কমিউনিস্ট পার্টির মুরুব্বিরা মনে করেছিলেন 'স্বপ্ন', 'অবাস্তব', 'পরাবাস্তব', 'বিমূর্ততা' এসব নিয়ে অতিরিক্ত চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা বিপজ্জনক। কে জানে বেঁচে থাকলে সুকুমার রায়ের কপালেও এরকম কিছু জুটত কি না! একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'আবোল তাবোল'? কী হচ্ছে কী?

কৃশ কাব্যগ্রন্থ। ছেচল্লিশটি মাত্র কবিতা। কিন্তু কী অসম্ভব তার অভিঘাত! কী প্রচন্ড তার প্রতাপ! তিনি এতটাই অননুকরণীয় যে কোনও উত্তরসূরি নেই। পূর্বসূরি তো অসম্ভব। ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশ। প্রবেশক কবিতায় সহর্ষ ঘোষণা—'আয় খ্যাপা মন ঘুচিয়ে বাঁধন/ জাগিয়ে নাচন তা ধিন ধিন/ আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া/ নিয়মহারা হিসাবহীন।' কীসের হিসেব? কীসের নিয়ম? সমাজের, ভাষার, মতাদর্শের, মাতব্বরির। তত্ত্ব, মনীষীবচন আর আপ্তবাক্যের গোলকধাঁধায় সাজানো তাকবন্দি এই মানবসমাজে সুকুমার রায় আর তাঁর 'আবোলতাবোল' তাই চিরন্তন বিপজ্জনক। আধুনিক, উত্তর-আধুনিক সমস্ত বাউন্ডারি পেরিয়ে সে এক অনবদ্য ছক্কা!

আর্তুর র‍্যাঁবো, আধুনিক কাব্যদর্শনের সুমহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিখ্যাত কবিতায় 'ভাওয়েলের' রং দেখেছিলেন। A,E,I,O,U–এই পাঁচটি অক্ষর বর্ণময় রূপে ধরা পড়েছিল তাঁর চোখে। A- কালো, E - সাদা, I- লাল, O-নীল, ড্ড- সবুজ। একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন এক ইন্দ্রিয় আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সহযোগে কবিকে হয়ে উঠতে হয় 'দ্রষ্টা'। কল্পনা আর অনুভূতির এই চমকপ্রদ মিশেল সারা বিশ্বজুড়ে কাব্য পাঠককে মুগ্ধ করেছে। আজও এই সনেট তুমুল প্রশংসায় বন্দিত। পরবর্তী ফরাসি কাব্যতাত্ত্বিকরা অবশ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে আর কেন অক্ষরে এই রং দেখতে পান কবি। ওই কবিতার (যার মূল নাম 'Voy elles') পরবর্তী পঙক্তিগুলিতে যে অনুষঙ্গ ধরে দিয়েছেন র‍্যাঁবো, তাতে ফুটে ওঠে কল্পনাপ্রতিভার আবছা যুক্তিপরম্পরা। যেমন I। উল্লম্ব থেকে আনুভূমিক করলেই তার চেহারা হয় H। মনে ছবি আসে ঠোঁটের। ওষ্ঠরঞ্জনীর পরশে তা রক্তিম। সেকারণে I– র‍্যাঁবোর চোখে লাল।

মহান স্রষ্টাদের তুলনা অর্থহীন। শুধু এটুকু হয়তো বলা যায়, 'দৃষ্টা' কবি হিসেবে সুকুমার কোথাও পিছিয়ে থাকেন না। 'আবোল তাবোল' জুড়ে ঝলসে ওঠে কল্পনাপ্রতিভার এধরনের বিবিধ বর্ণালী। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়ে তার অনায়াস সাবলীল যাতায়াত। 'ডাডাবাদ', 'পরাবাস্তববাদ', 'প্রতীকবাদ' এসব তত্ত্বকাঠামোর তোয়াক্কা না করে তিনি তৈরি করেন 'অসম্ভবের ছন্দ', তৈরি করেন 'খেয়ালরসের' অনবদ্য মুর্চ্ছনা। লক্ষ করা যাক দুটি দৃষ্টান্তের দিকে—

ক) 'নিমের ছায়া ঝিঙের ছাঁয়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক্।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।'
(ছায়াবাজি)

খ) 'শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?

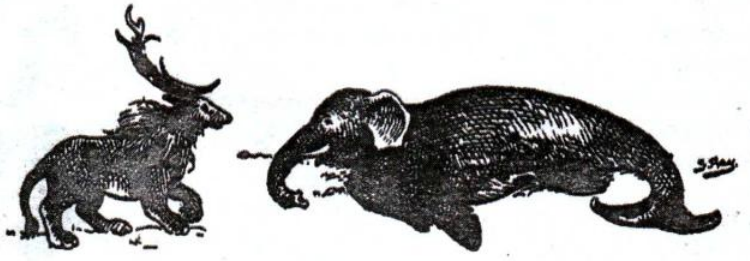

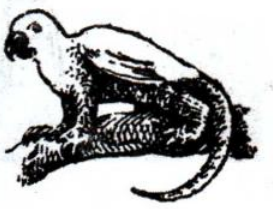

কৃশ কাব্যগ্রন্থ। ছেচল্লিশটি মাত্র কবিতা। কিন্তু কী অসম্ভব তার অভিঘাত! কী প্রচন্ড তার প্রতাপ! তিনি এতটাই অননুকরণীয় যে কোনও উত্তরসূরি নেই। পূর্বসূরি তো অসম্ভব। ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশ। প্রবেশক কবিতায় সহর্ষ ঘোষণা—'আয় খ্যাপা মন ঘুচিয়ে বাঁধন/ জাগিয়ে নাচন তা ধিন ধিন/ আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া/ নিয়মহারা হিসাবহীন।'

সুকুমার রায় ২০১৩

আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন্ আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপ্‌নি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ!
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—

নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধায় ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

ভাল রে ভাল

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—

এই দুনিয়ার সকল ভাল,
আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হোথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল,
ময়লা ভাল ফর্‌সা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল,
মাছপটোলের দোল্‌মা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাক্‌ও ভাল,
টিকিও ভাল টাকও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেল্‌তে ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুন্‌তে ভাল
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
ঠান্ডা জলে নাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল—

—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।'

সূক্ষ্ম একটা কৌতুক আর মশকরার আবহ লুকিয়ে আছে এ পঙক্তিগুলিতে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার হাস্য-আবরণ ভেদ করে কল্পনার গরিমাকে যদি উপলব্ধি করেন পাঠক, তাহলে সহজেই মুগ্ধ হবেন। এ বইয়ের ভূমিকায় জানিয়েছিলেন সুকুমার— 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার।' প্রকৃতপক্ষে এই আজগুবি, উদ্ভট আর অসম্ভব হয়ে ওঠে সুকুমারের অস্ত্র। জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে আমাদের বুকের ওপর অতিযুক্তি, অতিবৈজ্ঞানিকতা আর অতিগাম্ভীর্যের তর্জনী—এ বই সেই নিয়মনিষ্ঠ, অনুশাসন নির্দিষ্ট কেতাবকেন্দ্রিক কৃত্রিমতাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। একটু মনোযোগী চোখে পড়ে তিনি বারবার অতিচেনা সব পরিস্থিতি পরিপার্শ্বকেই ব্যবহার করেন।

এসব উদ্ভট, আজগুবি যে আমাদের জীবনযাপনেরই ঘনিষ্ঠ সহচর সেকথা বারবার মনে করিয়ে দেন তিনি। আসলে আমাদের সাধারণ জীবনেরই আনাচে কানাচে কত কল্পনা আর অনুভূতির সামগ্রী সাজানো আছে থরে থরে, তারই হদিশ দেয় এই বই। আমাদের শ্বাসরুদ্ধ বাঁচা, আমাদের অন্তর্লীন রক্তক্ষরণময় বাঁচাকে বহুশাংশে কল্পনাকৌতুকের শুশ্রূষায় সহনশীল করে দেন তিনি।

'বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা,
ঠান্ডা রাতে সর্দিবাতে মরবি কেন দাদা?
হোকনা সকাল হোক না বিকাল হোক না দুপুরবেলা
থাক না তোমার আপিস যাওয়া থাক না কাজের ঠেলা—
এই দেখ না চাঁদনি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম। দেড়ে দেড়ে দেড়ে!'
(দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম)

২

এই আততি বা টেনশনটাই সুকুমারের 'আবোল তাবোল'- কে অবিস্মরণীয় করে রাখে। হালকা চালে, পরিচিত পরিসর, চিরচেনা চরিত্র, আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করে রঙ্গকৌতুকের ফুলকি ছড়িয়ে আসলে তিনি আমাদের নিয়ে যান এক গভীরতর জগতে। যেখানে খেলা করে কল্পনা, চিন্তা, স্বপ্ন, অবাস্তব, আজগুবি। তারা কেউ জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, জীবন-সংলগ্ন।

সে কারণে 'আবোল তাবোল' নানা বয়সে, নানাপাঠে, নতুন নতুন অর্থে সংরক্ত হয়ে উঠতে পারে। লক্ষ করে দেখেছেন কি, 'রামগরুড়ের ছানা'-র ঠিক পরেই থাকে 'আহ্লাদী'? দুই বিপরীত এক্সট্রিম? তিনি কি বলতে চান এর মাঝখানেই থাকে বিশ্বজীবনের ভারসাম্য? উত্তর গঠনবাদী কোনও তাত্ত্বিক কি লক্ষ করেন 'গল্প বলা' কবিতায় দেরিদা কথিত স্থগিতায়ন বা ডেকারেন্স? 'চোরধরা' বা 'নারদ! নারদ! ' কবিতায় ছবি ছাড়া কবিতাকে কি বোঝা যাবে? একে কি 'গ্রাফিক নভেল' বা 'কমিকস স্ট্রিপ'-এর ভিন্ন পরীক্ষা হিসেবে দেখা যায়? 'একুশে আইন' কিংবা 'গন্ধ বিচার' কি চিরায়ত ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতি নির্মম বিদ্রূপ? এইসব অসামান্য পঙক্তি কাদের দিকে ইঙ্গিত করে?

'আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে/ দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে; / তাই দেখে খুঁৎ ধরা বুড়ো কয় চটে / দেখ্‌ছ কি, এই রং পাকা নয় মোটে।'

৩

'আবোল তাবোল'-এর বয়স হল নব্বই। এত দীর্ঘদিন ধরে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন বহুমান্য ব্যক্তিত্ব। আজও তবু শেষ কথা বলা যায়নি। হয়তো যাবেও না। এত অর্থ-অর্থান্তর, এত স্তর-স্তরান্তর মিশে আছে এ বইয়ের পরতে পরতে যে, তাকে অনুভব করে হতবাক হয়ে বসে থাকতে হয় শুধু।

ফিরে আসি আঁদ্রে ব্রেতঁ-র প্রসঙ্গে। প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তিনি বলেছিলেন, 'অতএব, আমরা স্থির সংকল্পে উপনীত হই, অবিশ্বাস্য সদাসর্বদা সুন্দর, যা কিছু অবিশ্বাস্য তা সুন্দর, আর কিছু নয় শুধু অবিশ্বাস্যই সুন্দর।' তাঁকে জেরা করেছিল যারা তার বুঝতে চায়নি এসব কথার মাহাত্ম্য! সেসব যান্ত্রিক, কল্পনাবিরোধী, কঠোর অনুশাসনপন্থীদের উদ্দেশেই কি লিখেছিলেন সুকুমার- 'আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ / বোঝে নাকো কোনও কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব...?' ❖

'আবোল তাবোল'-এর বয়স হল নব্বই। এত দীর্ঘদিন ধরে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন বহু মান্য ব্যক্তিত্ব। তবু শেষ কথা বলা যায়নি। হয়তো যাবেও না। এত অর্থ-অর্থান্তর, এত স্তর-স্তরান্তর মিশে আছে এ বইয়ের পরতে পরতে যে, তাকে অনুভব করে হতবাক হয়ে বসে থাকতে হয় শুধু। ভূমিকায় জানিয়েছিলেন সুকুমার— 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার।'

সুকুমার রায় ২০১৩

খাই খাই

খাইখাই কর কেন, এস বস আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব,—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড় সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্‌রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘন্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।

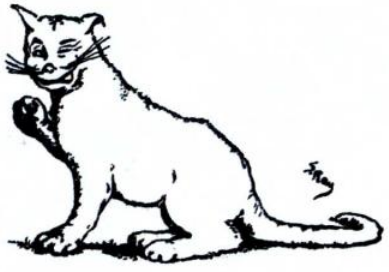

দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা;
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বস না—
সবে হল খাওয়া শুরু, শোন শোন আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা;
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায়রে—
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায়রে।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্,
পিছ্‌লে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোন, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।

কচুপোড়া আসলে পোস্টমডার্ন খাদ্য

প্র শা ন্ত মা জী

শুরুতেই গলায় কাপড় দিয়ে নতমস্তকে স্বীকার করে নিই, শুধু 'খাই খাই' কেন, সুকুমার রায়ের কোনও রচনাই যে বয়সে পড়ার কথা ছিল, আমরা তা পড়ার সুযোগ পাইনি। অনেক অনেক পরে সে সুযোগ এল যখন, তখন বুঝলুম ঢের দেরি হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, আমরা 'সহজ পাঠ'-ও পাইনি আমাদের ছেলেবেলায়। আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নিষ্ঠুর নিউজ প্রিন্টের হলুদ পাতায় ছাপা কালো অক্ষরের 'বর্ণপরিচয়'-এ। যার পাতা ওল্টাতে গেলে বার বার ছিঁড়ে এবং মুড়ে যেত। ওই অবস্থা থেকে আর একটু বড় হয়ে আমরা গ্রাম্য গ্রন্থাগার থেকে পেয়েছি 'যখের ধন' বা 'আবার যখের ধন'। আমরা 'ভোঁদড় বাহাদুর', 'ক্ষীরের পুতুল', বা 'চাঁদের পাহাড়', এসব পড়েছি কত পরে—তা বললে হাসির উদ্রেক হবে। তাই সেসব থেকে বিরত থাকছি। অর্থাৎ এতক্ষণ যা বলার চেষ্টা করছি যে ওই দুঃস্থ পাঠের দরুন আমরা সব সময় পিছিয়ে থেকেছি। আধুনিকতায়। জীবনচর্যায়। আদবকায়দায়। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা না পেলে যা হয়। পিছিয়ে পড়তে হয়। তাই পড়ে যেতে হয়। 'আদা-নুন' খেয়ে শুধু পাশ করার জন্য পড়া নয়। এ-জীবনে ঠিকঠাক পড়াশোনাটা তাই এখনও হল না।

এখন ওই যে 'আধুনিকতা' বা 'মডার্নিজম' যদি ঠিক আয়ত্বে না থাকে, তবে বুঝবো কী করে 'পোস্ট মডার্নিজম'! তাই 'খাই-খাই'—এক পোস্টমডার্ন রচনা কি না তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। হ্যাঁ, আমি যা বলতে পারি, 'খাই-খাই' শুধু নয় গোটা সুকুমার রায়ের জগৎটাই ভারী আধুনিক। ধীরে ধীরে এটা বুঝেছি তাঁর 'অসম্ভবের ছন্দ'-তে বা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে ঠিকঠাক দেখার জোরালো ক্ষমতায়। 'পোস্টমডার্ন'-এর যে দুটি বাংলা অনুবাদ দেখতে পাচ্ছি, 'উত্তর আধুনিকতা' আর 'অধুনান্তিকতা'। বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে একদল ব্যাখ্যা করেছেন 'উত্তর আধুনিকতা' নামে বাংলা কবিতায় যে আন্দোলন হয়েছে তার সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার পোস্টমডার্ন ভাবনাচিন্তার নাকি কোনো যোগই নেই! তাঁরা তাই চয়ন করেছেন 'অধুনান্তিকতা'। আমার ভোট তবু রইল 'উত্তর আধুনিকতা'-র দিকে।

শুধু কিশোরসাহিত্য নয়, সমগ্র সৃষ্টির জগৎটিকে তখনই মনে হয় আধুনিক, যখন দেখি পঞ্চাশ বছর আগেও তা যেমন মুগ্ধ করত, আজও তা অনুরূপ ভাবে মনোমুগ্ধকারী, যথার্থ। ফলে সেই সৃষ্টিকে 'মডার্ন', 'পোস্টমডার্ন' বা তারও পরে যা আসবে তা অনায়াসে দেগে দেওয়া যায়—এমনটাই বার বার মনে হয়েছে। একটি শিশু সুকুমার রায় পড়ছে পঁচিশ বছর আগে যে অনাবিল হাসিতে, এখনও অন্য এক শিশু অনায়াসে পড়ে যাচ্ছে অনুরূপ মুগ্ধতায় হাসিতে—সেই লেখাই তো নতুন, আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক।

কথা হচ্ছিল সুকুমার রায়ের বিচিত্র জগৎ এবং বিশেষ করে 'খাই-খাই' প্রসঙ্গে। আজ এই গভীর রাতে আমার বুক-শেলফ এর অল্প কিছু বই থেকে আমি নামিয়ে আনি ধুলো ঝেড়ে 'সুকুমার রচনা সংগ্রহ'—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। না 'সিগনেট' এর সুচারু মুদ্রণের 'খাই-খাই' নয়। তখন 'আধুনিকতা' বা 'উত্তর আধুনিকতা'র রং মেখে অন্যান্য বইগুলি আমার দিকে চেয়ে আছে। পাতা ওল্টালেই কিশোর সুকুমারের নিপাট ধুতি কালো কোট পরিহিত ফোটোগ্রাফটিই বলে দিচ্ছে সব কিছু—যা পড়তে চলেছি।

এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ-বা বুঝে আধা।

২

বেশ বলেছ ঢের বলেছ ঐখেনে দাও দাঁড়ি

'খাই-খাই' শুধু নয় গোটা সুকুমার রায়ের জগৎটাই ভারী আধুনিক। ধীরে ধীরে এটা বুঝেছি তাঁর 'অসম্ভবের ছন্দ'-তে বা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে ঠিকঠাক দেখার জোরালো ক্ষমতায়। একটি শিশু সুকুমার রায় পড়ছে পঁচিশ বছর আগে যে অনাবিল হাসিতে, এখনও অন্য এক শিশু অনায়াসে পড়ে যাচ্ছে অনুরূপ মুগ্ধতায় হাসিতে—সেই লেখাই তো নতুন, আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক।

সুকুমার রায় ২০১৩

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, "বল্‌তে পারিস্ সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।"

খানিক বাদে কহেন বাবু "বল্‌ত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্‌ত কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

আবার ভেবে কহেন বাবু "বল্‌তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চুড়ো?
বল্‌ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বল্‌ব কি আব, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম।
আমরা শোব খাট্ পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্‌টে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি 'সঙ্গে নে যাও' বলব 'কলা এই নে'।
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন্ জুতোয় মচমচ্।
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্।
আমরা পরি রেশমি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সেসব পাও না ব'লে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কি প্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে।

হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।

ঠিক সময়ে সুকুমার রায় পড়লে কী হত জানি না এখন। তবে না পড়লেও তাঁর ওই আজব জগৎটিকে আমরা দেখেছি সর্বান্তকরণে। ফলে 'বর্ণপরিচয়' জ্ঞানেই বুঝতে অসুবিধে হয়নি—হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা কী বস্তু। পড়া তো পরে, আগে তো দেখতে হয়। ঠাকুর বলেছেন না—'যে দেখে, সে আঁকে।' সুকুমারও দেখেছেন এবং লিখেছেন প্রবল পরাক্রমে। না হলে লিখতে পারতেন—

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে!

আর 'বিদ্যে বোঝাই' বুঝেছি আরও বড় হয়ে এবং কোনও ভাবে পণ্ডিত না হয়ে। যখন তত্ত্বকথা শুনলেই মাথা ঝিমঝিম করেছে।

৩

এবার একটু সরাসরি অভিজ্ঞতায় আসি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনও কিছুতেই যে আমল দিতে পারিনি কখনও। অর্থাৎ অপরের মুখে ঝাল খেয়ে।

আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে আমি আমার শিশুপুত্রকে দিয়ে একটি পরীক্ষা করেছিলুম ছড়া পাঠের পাঠশালায়। নিজে যখন সুযোগ পাইনি, তার হাতে তুলে দিয়েছিলুম সুকুমার রায় থেকে, 'আইকম বাইকম', অন্নদাশঙ্কর থেকে সেই আমলের শক্তি চাটুজ্জে পর্যন্ত। সুর সহযোগে পড়ে শুনিয়ে দেখেছি, সব বাদ দিয়ে সে হাতে তুলে নিয়েছে সুকুমার রায়। তাঁর 'খাই-খাই', 'হযবরল' বা ননসেন্সগুলি—

মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম।

তাই বলেছি তখন—জয় হোক সুকুমার রায়ের। বাঙালির ঘরে ঘরে শিশুদের হাতে তুলে দিন তাঁকে, 'হাম্পটি-ডাম্পটি'-র পাশাপাশিই। হ্যাঁ, এই তো সেদিন আমার নিকটতম প্রতিবেশী নাতনিকে যেই শুনিয়েছি, একবারেই তা তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। সে নেচে গেয়ে আমায় শোনালো, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

বলব কী ভাই হুগলী গেলুম
বলছি তোমায় চুপি চুপি
দেখতে পেলুম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি।

৪

এত বলে, আর ধীরে ধীরে নয়, বুঝে গেছি সুকুমার রায় এবং তাঁর 'খাই-খাই'—মডার্ন, পোস্টমডার্ন এবং আগামী দিনে তারও পরে যদি কিছু থাকে। 'খাই-খাই'-এর সব কিছু বললে এ লেখা দীর্ঘতর হবে। শুধুমাত্র 'খাই-খাই'-এর তুলনা আমরা আমাদের শিশু সাহিত্যে দ্বিতীয়টি কি পেয়েছি কখনও? এমনিতেই খাবার জগৎটি লোভনীয়, স্বাদু এবং জিভে জল উদ্রেককারী। বাঙালির যা কিছু আর অবশিষ্ট আছে—তার মধ্যে প্রথমেই এই খাওয়ার নাম করতে হয়। বাংলা ভাষার যত কিছু খাওয়ার কথা লেখা আছে তা কী অসাধারণ ক্ষমতায় পাঞ্চ করেছেন সুকুমার রায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

কত রকমের খাওয়া হতে পারে এখনকার নব্য পড়ুয়ারা বুঝবে কী করে—'খাই-খাই' না পড়লে? শুধু যে ডাল-ভাত খাওয়া নয়, লুচি-রুটিও নয়, জ্যাঠা ছেলের বিড়ি খাওয়াও শুধু খাওয়া নয়—তার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে তিনি বুঝিয়ে ছেড়েছেন—মাথা খাওয়া, খাবি খাওয়া, মুখ-খাওয়া, টোল খাওয়া—এরকম হরেক রকম খাওয়াকে। এবং একবার পড়লে তা শিশুমনে গেঁথে যায়।

বাই দ্য ওয়ে। 'কচুপোড়া' কেউ খেয়েছেন নাকি? কেমন তা খেতে?

'খাই-খাই' আবার পড়ে এবং এ-লেখাটি শুরু করার আগে আমি নিজে চেখে তা দেখেছি। এর তুলনায় 'পোস্টমডার্ন' খাবার আর হয়নি।

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘন্টা। ❖

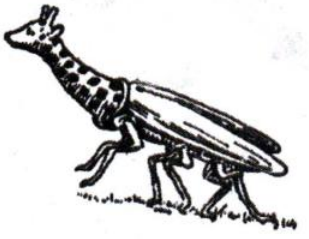

শুধুমাত্র 'খাই-খাই'-এর তুলনা আমরা আমাদের শিশু সাহিত্যে দ্বিতীয়টি কি পেয়েছি কখনও? বাংলা ভাষার যত কিছু খাওয়ার কথা লেখা আছে তা কী অসাধারণ ক্ষমতায় পাঞ্চ করেছেন সুকুমার রায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কত রকমের খাওয়া হতে পারে এখনকার নব্য পড়ুয়ারা বুঝবে কী করে—'খাই-খাই' না পড়লে? একবার পড়লে তা শিশুমনে গেঁথে যায়।

সুকুমার রায় ২০১৩

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

২৬শে জুন ১৯২২—কারাকোরম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু ঘন্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছ প্রকান্ড বেলের মত মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে—এক একটা দেড় হাত লম্বা। আর একটা গাছে ঝিঙের মত কী-সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাব্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল। আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষনাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না।

আজ সকালে এক কান্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠান্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে যে, সংসারে তার কোনও সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মতো মুখ করে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

হাইপার রিয়েল জগতে খিদের ন্যারেটিভ

অংশুমান কর

আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। টেবিলের উল্টোদিকে আমার এক সহকর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয় নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি চিৎকার করছেন। আর আমি শুনছি। চিৎকার যিনি করছেন, নানা বিষয়ে মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও, তিনি আমাকে এতখানি ভালোবাসেন আর আমি তাঁকে এতখানি শ্রদ্ধা করি যে বলবার বেশ কয়েকটা কথা থাকলেও বলতে পারছি না। কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি। উত্তর দিচ্ছি না দেখে একসময় চিৎকার থামল। পরের দিন বিভাগে ঢোকার মুখেই আমার সেই সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'কি বেচারাথেরিয়াম, রেগে নেই তো?' রাগব কি, হেসে উঠলাম হো হো করে! উনিও হাসতে হাসতে বললেন, 'রেগো না, চিল্লানোসোরাস শুধু চিৎকারই করে, কামড়ায় না!' আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় এভাবেই ঢুকে পড়েন সুকুমার রায়, ঢুকে পড়ে হেশোরাম হুঁশিয়ারের বিখ্যাত ডায়েরি, আর নিজের সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা সুকুমার তাঁর জন্মের ১২৫ বছরেও বাঙালির মুখে ভাষা জোগান।

প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরিতে প্রথম এনট্রিটির তারিখ হল ২৬ জুন, ১৯২২ আর শেষ এনট্রিটির তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। মোট এনট্রি ৫টি। তার মধ্যে দু'টির ক্ষেত্রে বছর উল্লেখ আছে। বাকি তিনটির ক্ষেত্রে নেই। তাই ধরে নিতে হয় যে শেষ এনট্রিটিও ওই ১৯২২ সালেরই। অর্থাৎ, আড়াই মাস ধরে প্রফেসর হুঁশিয়ার কারাকোরমের বন্দাকুশ পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁর অভিযান চালান। সঙ্গী তাঁর ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দু'জন শিকারী ছক্কড় সিং আর লক্কর সিং, ছ'জন কুলি আর একটি কুকুর। অভিযানটি অবশ্য নামেই শিকার অভিযান। গোটা অভিযানে শিকার করা হয় না একটি প্রাণীকেও। ল্যাগব্যাগর্নিসকে ধরে নিয়ে আসার একটা চেষ্টা করা হয় বটে তবে সে চেষ্টাও সফল হয় না। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশ্য প্রফেসর হুঁশিয়ার আর চন্দ্রখাই সেরে ফেলে। বন্দাকুশ পাহাড়টিকে তারা মেপে ফেলে। প্রফেসর হুঁশিয়ার যখন মাপেন তখন বন্দাকুশ পাহাড়ের উচ্চতা হয় ষোলো হাজার ফুট, চন্দ্রখাই মাপলে উচ্চতা হয় বিয়াল্লিশ হাজার ফুট, আবার দু'জনে মিলে মাপা হলে দেখা যায় উচ্চতা হল দু'হাজার সাতশো ফুট। বন্দাকুশ পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে এই অদ্ভুত হিসেবেই অবশ্য প্রফেসর হুঁশিয়ারের গোলমেলে অভিযান আটকে থাকে না। শিকার করা যায় না বটে তবে এই অভিযানেই দেখা মেলে বিচিত্র সব প্রাণীর যাদের বিজ্ঞানের কোনও বইতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমে যে প্রাণীটির সঙ্গে প্রফেসর হুঁশিয়ার আর তার দলবলের দেখা হয় তাঁকে প্রথমে মনে হয় প্রকাণ্ড একটা মানুষ, তারপর মনে হয় মানুষ নয় একটা বাঁদর, তারপর বোঝা যায় মানুষও নয়, বাঁদরও নয়, একটা নতুন রকমের জন্তু। সে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল টপাটপ খেয়ে ফেলে, একখানা পাঁউরুটি, আধসের গুড় আর পাঁচ-সাতটা খোলা সুদ্ধ ডিম। হ্যাংলা এই প্রাণীটির নাম দেওয়া হয় হ্যাংলাথেরিয়াম। দ্বিতীয় যে প্রাণীটির সঙ্গে প্রফেসর হুঁশিয়ার আর তার সঙ্গীদের দেখা হয় তার নাম দেওয়া হয় গোমরাথেরিয়াম। সে এমন এক প্রাণী যে চির-অসুখী, চির-অসন্তুষ্ট, চির-খিটখিটে, চির-খুঁতখুঁতে। প্রফেসর হুঁশিয়াররা খাবার-টাবার দিয়ে তাকে একটু তোয়াজ করার চেষ্টা করেন বটে, তবে তোয়াজের ফল হয় উল্টো। একটুখানি পেয়ারার জেলি খেয়ে গোমরাথেরিয়াম এমন চটে যায় যে সারা গায়ে মাখন

প্রথমে যে প্রাণীটির সঙ্গে প্রফেসর হুঁশিয়ার আর তার দলবলের দেখা হয় তাঁকে প্রথমে মনে হয় প্রকাণ্ড একটা মানুষ, তারপর মনে হয় মানুষ নয় একটা বাঁদর, তারপর বোঝা যায় মানুষও নয়, বাঁদরও নয়, একটা নতুন রকমের জন্তু। সে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল টপাটপ খেয়ে ফেলে, একখানা পাঁউরুটি, আধসের গুড় আর পাঁচ-সাতটা খোলা সুদ্ধ ডিম।

সুকুমার রায় ২০১৩

ল্যাগব্যাগর্নিস্

১৪ই আগস্ট বন্দাকুশ, পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর। ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্।—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড় একটা অদ্ভুত রকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চলবে তার কিছুই যে ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো, বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়্‌কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্‌মুড়্ করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কী তখন! আমি আর দুজন কুলি ছক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি; সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক, এ ল্যাগ্‌ব্যাগ্ পাখি বা ল্যাগ্‌ব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

আর জেলি মাখিয়ে সে মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে। গোমরাথেরিয়াম এর সঙ্গে প্রফেসর হুঁশিয়ার-এর দেখা হয় ২৪ জুলাই আর ১৪ আগস্ট দেখা মেলে ল্যাগব্যাগার্নিসের। তাকে দেখতে অনেকটা নাকি উটপাখির মতো আর তার চলনের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। তার ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ পা ওদিকে, সামনে চলতে দিয়ে সে পিছন দিকে চায়, দশ পা যেতে না যেতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। এমন ভারসাম্যহীন, তালকানা পাখিটিকেও কিন্তু শেষমেষ ধরা যায় না। লক্কড় সিং আর ছক্কড় সিং এর মারামারির মধ্যে কোনও সময় সে পালিয়ে যায়। ল্যাগব্যাগার্নিসকে ধরতে না পারলেও লক্কড় সিং ধরে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক জানোয়ারকে, যাকে দেখে প্রফেসর হুঁশিয়ারের দলবল তাঁবুর আড়ালে পালাতে গিয়ে শেষমেষ লক্কড় সিং-এর অভয়বাণী শুনে বেরিয়ে এসে জানতে পারে যে, প্রকাণ্ড এই জন্তুটা নেহাতই নিরীহ। তার পায়ে কাঁটা ফুটে দরদর করে রক্ত পড়ছিল, লক্কড় সিং সেই কাঁটা তুলে, ক্ষত জল দিয়ে ধুয়ে রুমাল বেঁধে দিয়েছে, তারপর জন্তুটা তার পিছু নিয়েছে দেখে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে ওকে। পায়ে ক্ষত, তাই জন্তুটার নাম হল ল্যাংড়াথেরিয়াম। যেদিন ধরা পড়ে সেদিন বিকেলেই ল্যাংড়াথেরিয়াম যখন এক মনে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তখনই শোনা গেল ভয়ঙ্কর চিৎকার। চিৎকার শুনে ল্যাংড়াথেরিয়াম বাঁধন ছিঁড়ে, দৌড়ে, লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর দেখা মিলল চিল্লানোসোরাস আর বেচারাথেরিয়ামের। চিল্লানোসোরাস কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, আবার তিনটেরই কিছু কিছু আদল তার আছে। চিল্লানোসোরাস চিৎকার করে প্রাণপণে, মনে হয় এই বুঝি খেয়ে ফেলল বেচারাথেরিয়ামকে, কিন্তু খায় না। শেষমেষ সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর জলে মিলিয়ে যায়। প্রফেসর হুঁশিয়ারের অভিযান শেষ হয়ে যায় যখন পাহাড়ের গা থেকে বাদুড়ের মতো ঝুলতে থাকা তিমি মাছের মতো বিশাল কিছু ভয়ঙ্কর জন্তু তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় আর তাদের ডানার ঝাপটায় কম-বেশি আহত হয় সকলে, তারপর অনেক কষ্টে ঘরে ফেরে।

প্রফেসর হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি যে জগতের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলে সে জগৎ টিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক। কিন্তু আসলে তা পোস্টামডার্ন। অবশ্য, তাত্ত্বিকেরা বলতে পারেন প্রাগৈতিহাসিকের সঙ্গে পোস্টমডার্নের কোনও বিরোধ নেই, পোস্টমডার্নিজমকে কেবল কালখণ্ডের দ্যোতক হিসেবে দেখা ভুল, পোস্টমর্ডানিজম এক প্রবণতা, লক্ষ্মণ। সুকুমারে তাই যাহা প্রাগৈতিহাসিক তাহাই পোস্টমডার্ন। কিন্তু কেন পোস্টমডার্ন? পোস্টমডার্নিজমের লক্ষ্মণগুলিকে নানা তাত্ত্বিক নানাভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে লিওতার এবং বদ্রিলা পোস্টমডার্নিজমের এই দুই মহাতাত্ত্বিকের কাজকর্মকে মাথায় রাখলে একথা বলা যায় যে অনিশ্চিতি, মহাসন্দর্ভের (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ-এর) প্রতি অবিশ্বাস আর এক হাইপার-রিয়্যাল (এর সঠিক বাংলা করা একটু কঠিনই বোধহয়) জগতে (এ এমন এক জগত যেখানে মূল বলে আর কিছু নেই, যা আছে তা সবই প্রতিরূপ) বাস-অভিজ্ঞতা—এগুলোই বোধহয় পোস্টমডার্নিজমের মূল লক্ষ্মণ। এই সব লক্ষ্মণগুলিই তো হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরিতে পূর্ণমাত্রার উপস্থিত। বন্দাকুশ পাহাড়ের উচ্চতা যেমন ঠিক কতটা তা বোঝা যায় না। ষোলো হাজার ফুট হতে পারে, বিয়াল্লিশ হাজার ফুট হতে পারে আবার দু'হাজার সাতশো ফুটও হতে পারে।

বন্দাকুশ পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে এই গোলমেলে হিসেব থেকেই বোঝা যায় যে জগতের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ছি সেই জগতে কোনও কিছুই আর নিশ্চিত নয়। এমন সব জন্তুর দেখা মেলে এ জগতে, যাদেরও মনে হয় কোনও মূল নেই, যারা বোধহয় শুধুই প্রতিরূপ। কমপিউটারের স্ক্রিনে মাউসের কারসাজিতেই বোধহয় এদের জন্ম। এমন কী যেভাবে লেখা প্রফেসের হুঁশিয়ারের ডায়েরির এই আখ্যান, সেটিও আঙ্গিকের দিক থেকে উত্তরআধুনিক বইকী! আখ্যানের শুরুতেই দুটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সুকুমার জানান যে 'সন্দেশে' জীব জন্তুদের কথা ছাপা হচ্ছে অথচ প্রফেসর হুঁশিয়ারের শিকার কাহিনি ছাপা হয়নি। এ জন্য প্রফেসর হুঁশিয়ার 'সন্দেশে'র ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এরপরই শুরু হয়ে যায় প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরি। ডায়েরি যেখানে শেষ হয় সেখানেই আবারও প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রবেশ ঘটে সুকুমারের। তিনি জানান যে আরও তথ্য চেয়ে পাঠানো তাঁদের চিঠির উত্তরে প্রফেসর হুঁশিয়ার পাঠাচ্ছেন ভাগ্নে চন্দ্রখাইকে। এরপর চন্দ্রখাই-এর সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর কথোপকথন। এই কথোপকথনের একদিকে থাকেন 'চন্দ্র' আর অন্যদিকে 'আমরা', অর্থাৎ 'সন্দেশ'। এই কথোপকথনের শেষে প্রথম বন্ধনী ছাড়াই সুকুমারের প্রবেশ। সুকুমার এবার জানান তাদের ছাপাখানার এক ছোকরা ঠাট্টা করে চন্দ্রখাইকে জিজ্ঞেস করে চন্দ্রখাই কোন থেরিয়াম। চন্দ্রখাই-এর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আর এক ছোকরা জানিয়ে দেয় চন্দ্রখাই হল গল্পথেরিয়াম, বসে বসে গল্প বানাচ্ছেন। এ কথা শুনে চন্দ্রখাই 'সন্দেশ'-এর টেবিল থেকে একমুঠো চিনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান তুলে নিয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। এই যে চার-পাঁচ পাতার একটি আখ্যানের মধ্যে এতোগুলি জঁর ব্যবহার করেন সুকুমার কোনও সন্দেহ নেই যে এই ব্যবহার নীরিক্ষার দিক থেকে পোস্টমর্ডান।

চন্দ্রখাই এর সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর কথোপকথনটি অন্য

বন্দাকুশ পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে এই গোলমেলে হিসেব থেকেই বোঝা যায় যে জগতের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ছি সেই জগতে কোনও কিছুই আর নিশ্চিত নয়। এমন সব জন্তুর দেখা মেলে এ জগতে, যাদেরও মনে হয় কোনও মূল নেই, যারা বোধহয় শুধুই প্রতিরূপ। কমপিউটারের স্ক্রিনে মাউসের কারসাজিতেই বোধহয় এদের জন্ম। আঙ্গিকের দিক থেকে উত্তরআধুনিক বইকী!

সুকুমার রায় ২০১৩

তিমি মাছের মতো মস্ত কী জন্তু

৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে। —নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নীচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কট্‌কটাং-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে নাই—খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটান আর জন্তুটার ভয়ানক কটকটাং আওয়াজ। একটু খানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলের গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমার সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর-এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

একটি বিশেষ কারণেও উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রখাইরা যা দেখে এসেছে তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ-টমাণ আছে কি না, 'সন্দেশ'-এর এই প্রশ্নের উত্তরে রীতিমতো রেগে গিয়ে চন্দ্রখাই জানায় প্রমাণের কোনও দরকার নেই, তাদের আঁকা কয়েকটা ছবি আর তাদের উপস্থিতি সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চন্দ্রখাই-এর সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর এই বিরোধ আসলে দুই পৃথিবীর বিরোধ। এক পৃথিবী যা নিশ্চিতি খোঁজে, যেখানে নিশ্চিতি পৌঁছোতে চায় মূলে, খোঁজে বিশ্বাস, আর বিশ্বাস দাবি করে প্রমাণ। আর এক পৃথিবী যেখানে অনিশ্চিতি আর অবিশ্বাস-ই শেষ কথা, যেখানে মূল-এর তোয়াক্কা না করে চলে প্রতিরূপরাজ! এই যে দুই পৃথিবীর দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্বের কারণেই 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'-কে আর নিছকই একটি পোস্টমডার্নিস্ট আখ্যান বলা যায় না। বরং মনে হয় পোস্টমডার্ন হয়েও টেক্সটটি বুঝি পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কেই একটি-দুটি প্রশ্ন তুলে দেয়। আসলে একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকেই পোস্টমডার্নিজমকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমান রূপটির অঙ্গ হিসেবে এই তত্ত্বকে দেখেছেন কেউ কেউ, এমনটাও বলা হয়েছে যে, পোস্টমডার্নিজম আসলে নৈরাজ্যের জন্মদাতা ও উপাসক। এভাবে পোস্টমডার্নিজমকে পুরো বাতিল ঘোষণা করেন যাঁরা, তাঁরা হয়তো ভুলে যান যে এই তত্ত্বটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলেই স্থানিক ইতিহাস গুরুত্ব পেয়েছে, বহুত্বের একটি সাধনা চিন্তনের গভীর দাগ কেটেছে। যাঁরা এমনটাও বলেন যে পোস্টমর্ডানিজম নিজেই হয়ে উঠেছে এই সময়ের একটি গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ, তাঁরাও বোধহয় যতখানি চমক দেওয়ার জন্য এমন একটি কথা বলে থাকেন ততখানি প্রতিযুক্তি সাজাবার জন্য নয়। এইসব অভিযোগের বাইরেও আরও কতগুলি অভিযোগ অবশ্য পোস্টমডার্নিজমকে শুনতে হয়েছে। যেমন বদ্রিলা যখন বলেন যে উপসাগরীর যুদ্ধটা আসলে ছিল একটা হাইপার রিয়্যাল যুদ্ধ, বাস্তব না, তখন জনমানসে উপসাগরীর যুদ্ধের ফুটেজের প্রভাব মেনে নিয়েও, বদ্রিলাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় কি বা বিশ্বাস করা যায় কি? আরও বড় একটি প্রশ্ন হল এই যে, যে অনিশ্চিতি আর অবিশ্বাসের দুই পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে পোস্টমডার্নিজমের তত্ত্বটি, সেই অনিশ্চিতি আর অবিশ্বাসকে, জীবন, যে জীবন আমরা যাপন করি, সেই জীবন কতখানি জায়গা দেয়? মৌলবাদ আর সন্ত্রাসবাদ তো দাঁড়িয়ে অন্ধবিশ্বাসের ওপর। গোটা পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদ আর সন্ত্রাসবাদের এই উত্থানকে অনিশ্চিতি আর অবিশ্বাসের তত্ত্ব দিয়ে কি ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তাহলে কি এটা ঠিক যে তত্ত্ব আর যাপিত জীবনের মাঝে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে এক দুর্নিবার ফাঁক?

এইরকম একটা ফাঁক-ই কি সুকুমার হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরিতে দেখাতে চেয়েছেন? তাই কি ডায়েরি শুরু করার আগেই তিনি জানিয়ে দেন প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরিতে যা আছে তা সত্যি কি মিথ্যা তা বিচারের ভার পাঠকের? তাই কি চন্দ্রখাই-এর হাইপার রিয়্যাল জগতটির অস্তিত্বকে প্রশ্নে প্রশ্নে নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা করে 'সন্দেশ'-এর টিম? তাই কি যে জন্তুগুলিকে মনে হয় এক হাইপার রিয়্যাল জগতের বাসিন্দা তাদের কারও কারও সঙ্গে এমনই তীব্র মিল আমাদের কারওর যে আমার সহকর্মী নিজেকে চিম্পানোসোরাস আর আমাকে বেচারাথেরিয়াম ভাবতে পারেন?

আরও একটি কথা। খেয়াল করলে দেখা যায় হেশোরাম হুঁশিয়ারের আখ্যানটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রখাই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় যে কাজটিকে সেটি হল খাওয়া। প্রফেসর হুঁশিয়ার পর্যন্ত জানিয়ে দেন যে 'খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না'। শুধু চন্দ্রখাই নয় এমন কী জন্তুজানোয়ারগুলোরও কাজ যেন কেবলই খাওয়া। খিদের ওপর এতখানি গুরুত্ব দেন কেন সুকুমার? এটাই বোঝাতে যে খিদে হল এমন একটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ অনিশ্চিতির অস্ত্র দিয়েও পোস্টমডার্নিজম যাকে ঘায়েল করতে পারে না? হাইপার রিয়্যাল জগতেও, বোধহয়, একমাত্র যা রিয়্যাল তা হল খিদে? খিদে এমন এক চিম্পানোসোরাস যার কাছে বাঘা বাঘা তাত্ত্বিকেরাও হয়ে পড়েন নেহাতই বেচারাথেরিয়াম! ❖

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'-কে নিছকই একটি পোস্টমডার্নিস্ট আখ্যান বলা যায় না। বরং মনে হয় পোস্টমডার্ন হয়েও টেক্সটটি বুঝি পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কেই একটি-দুটি প্রশ্ন তুলে দেয়। আসলে একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকেই পোস্টমডার্নিজমকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

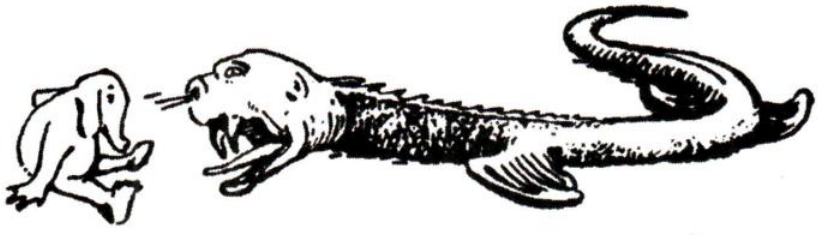

সুকুমার রায় ২০১৩

লক্ষণের শক্তিশেল

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, 'যা ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি, 'ফেলবারও দরকার হল না—সে একেবারে মরে গেছে।'

সকলে। বাঃ বাঃ! —একদম মরে গেছে—ব্যাস। আর চাই কি, খুব ফূর্তি কর!

(বাইরে গোলমাল)

ঐ দেখ্ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে। সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া!

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গেছে—'একেব্বারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

(দূতের প্রবেশ)

সকলে। কি হে, খবর কি?

দূত। আজ্ঞে আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ। ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?

রাম। আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল্।

দূত। আজ্ঞে, আমি ছান টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মান্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে। বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল্।

দূত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যার‍্যা—

সকলে। মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে!

জাম্বুবান। ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!

ভেঙেছেন মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য

গৌ র বৈ রা গী

সাহিত্যকর্ম হল সময়ের নির্মাণ। গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক হল স্রষ্টার কাছে উপলক্ষ মাত্র। তাঁর আসল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে সময়ের নির্মাণে। আবার স্রষ্টা যদি প্রতিভাধর কেউ হন তাহলে তাঁর রচনায় আপাত সরলতার ভেতর থাকে গূঢ় গোপন অভিপ্রায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি গল্প বলছেন, গল্পই বলছেন। সেই গল্পের এমন টান সাধারণ পাঠক তো বটেই বিদগ্ধ সমালোচকও বিভ্রান্তিতে পড়ে।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ সুকুমার যে নতুন কোনও গল্প বলেছেন তা অবশ্য নয়। রামায়ণের একটি চেনা পর্ব নাটকে তুলে এনেছেন। সকলের চেনা পরিচিত ঘটনায় কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য নেই। থাকার কথাও নয়। নতুন যা তা হল তার বলার ভঙ্গি। আমরা জানি সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব হল তার বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে নয়, অসঙ্গতি থেকে উৎপন্ন হওয়া হাস্যরসের প্রবহমাণতায়। আবার নাট্য সংলাপে সুকুমারের আসল কৌশল অসংগতি বা কৌতুকময় উপাদানের স্তূপীকরণ। প্রশ্নের বিচিত্র স্তূপীকরণে শুধু মজা নয় তার বহুমুখী ব্যঞ্জনায় আমরা অন্য এক আবহ তৈরি হতে দেখি।

মনে রাখতে হবে সুকুমার এই নাটকে মহাকাব্যের একটি খণ্ডাংশকে তুলে আনছেন। মহাকাব্য মানেই আমাদের মনে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের স্থির ছবি। চলমান এক মিথ। কিন্তু সুকুমার শুরু থেকেই এই গাম্ভীর্য এবং মিথ ভেঙেচুরে দিচ্ছেন। নিজেই তৈরি করছেন অসংগতি। সুকুমারের নাটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ একক সংলাপের নিজস্ব গড়ন আর তার অসামান্য কৃৎকৌশল। মহাকাব্যের মহৎ বিষয়কে লঘু করে দেখানো বা প্যারোডি।

মহাকাব্যের নায়ক যে রাম, শুধু মহাকাব্যই বা কেন, আসমুদ্র হিমাচল মানুষের মনের যে নায়ক তাকে জড়িয়ে যে মিথ তাকেও তিনি নাটকের শুরুতেই ভেঙেচুরে দিচ্ছেন। নাটক শুরুর সংলাপে রাম বলছেন, 'কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার সপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে।'

সংলাপে 'রাবণ ব্যাটা' আর 'লম্বা তালগাছ' এই শব্দবন্ধ প্রয়োগ করে নাট্যকার প্রথমেই ভেঙে দিচ্ছেন মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য। 'ভেতো বাঙালি', 'ভীতু বাঙালি' চরিত্র আমদানি করছেন তার নাটকে। এই আবহকে আরও জোরদার করছেন দূতের সংলাপে, 'আজ্ঞে আমি চান টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল। কিন্তু কী হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—'

পাঠক লক্ষ করবেন ব্যবহৃত শব্দাবলী, 'পুঁইশাক চচ্চড়ি', 'কুমড়ো ছেঁচকি', 'চাট্টি', 'পাঁজি'। শব্দগুলি লৌকিক এবং কথ্য। এর সঙ্গে জাম্বুবান (মন্ত্রী মশাই)-এর সংলাপে 'রেকারিং ডেসিমাল' এবং সুগ্রীব-এর সংলাপে 'ব্যাটা তুই ধারাবাহিক রূপে আদ্যোপান্ত পর্যায় পরম্পরা সব বলবি কিনা?'

সংলাপের মধ্যে এই যে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে লৌকিক এবং কথ্য আবার কখনও ইংরেজির মিশ্রণ এই অসংগতির স্বাভাবিক পরিণতি হল্ হাস্যরস। শুধু সংলাপের এই অসংগতিই নয় নাট্য মুহূর্তেও তৈরি হচ্ছে এমন হাস্যকর পরিস্থিতি।

রণক্ষেত্রে সুগ্রীবের ভয়ে ভয়ে হাঁটা দেখে বিভীষণ বলছে 'দেখ হাঁটছে দেখ। বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!'

সুগ্রীব তো আসলে বানরই। একথায় তার আঁতে ঘা লাগবে এ আর বেশি কথা কী। সে বলে, 'রেখে দাও

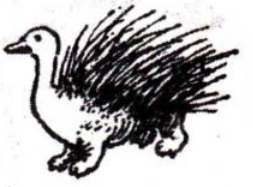

সুকুমার এই নাটকে মহাকাব্যের একটি খণ্ডাংশকে তুলে আনছেন। মহাকাব্য মানেই আমাদের মনে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের স্থির ছবি। চলমান এক মিথ। কিন্তু সুকুমার শুরু থেকেই এই গাম্ভীর্য এবং মিথ ভেঙেচুরে দিচ্ছেন। নিজেই তৈরি করছেন অসংগতি। সুকুমারের নাটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ একক সংলাপের নিজস্ব গড়ন আর তার অসামান্য কৃৎকৌশল।

সুকুমার রায় ২০১৩

রাবণ-সুগ্রীব কথা

সুগ্রীব। (গান) তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাঁটা
তোরে এখন রাখ্‌বে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্‌।
(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
তোর এখনি হবে প্রাণান্ত
আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্‌।।

রাবণ। (গান) ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব।।
ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া
আয় তবে আয় যষ্ঠির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া।।

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময়ে আজি
ইষ্টদেবে কররে নমস্কার।
তুইরে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার।।

রাবণ। ওরে বেয়াদপ কহিলে যে সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ
পাঠাবো শমন সদন।। (প্রহার)

সুগ্রীব। ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খুঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাবো কি শেষে? (সুগ্রীবের পলায়ন)

রাবণ। ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্‌! শেম্‌!!

তোমার ভড়ং। আমাদের দেশে ওরকম হাড়গিলের মত কেউ হাঁটে না।'

বিভীষণ—তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ তো!

সুগ্রীব—মানুষ বললে কেন হে? খামোকা গাল দিচ্ছ কেন?

সুগ্রীবের কাছে 'মানুষ' শব্দটা গালাগাল পর্যায়ের সেটা প্রকাশ করা হয়েছে এখানে।

পরে, লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত। তার পতন ও মূর্ছা।

এরপরেই সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটাচ্ছেন সুকুমার।

রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন। তখনই হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান—অ্যাঁ। কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি! (রাবণের পলায়ন)

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং শৌর্য বীর্যের প্রদর্শন থাকার কথা, সেখানে বিজয়ী বিজেতার 'পকেট লুণ্ঠন' করছে। অর্থাৎ টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়ার মতো পকেটমারি দেখানো হয়েছে। এ ঘটনাটি যে লজ্জার সেটা হনুমানের সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে 'দেখে ফেলেছি' এই ক্রিয়াপদটির মাধ্যমে। এবং শেষে একজন চোরের মত রাবণের পলায়ন এই অংশের হাস্যরসে এক চূড়ান্ত মাত্রা এনে দিয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ না করে 'হনুমানের বাতাসা খাওয়া।'

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না করে 'মন্ত্রীমশাই-এর ঘুমোনো।'

কৈলাস পর্বতের কথায় হনুমানের মন্তব্য—'কৈলাস ডাক্তার আবার কে?'

হনুমানের আনা পাহাড়ের নীচে যমের পতন হলে যমদূতদের মন্তব্য, 'হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?' 'মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি।'

সমগ্র নাটক জুড়েই এই অসংগতি, কোথাও শব্দ ব্যবহারে, কোথাও নাট্যমুহূর্তে। অথচ আমরা জানি, মহাকাব্যে এই অংশটি অত্যন্ত সিরিয়াস। রামায়ণের এটা সেই পর্ব যেখানে রাবণের ছোড়া শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাকে চৈতন্যে ফেরাতে হনুমানকে কৈলাস পাহাড়ে গিয়ে গন্ধমাদন পর্বতটা তুলে আনতে হয়েছিল। কেন না হনুমান বিশল্যকরণী গাছটা চিনত না।

এই অংশে রাবণের বীরত্ব, রামায়ণের মহানায়ক লক্ষ্মণের মুমূর্ষু অবস্থা। মরণাপন্ন সহনায়কের জন্য সকলের উদ্বেগ, হনুমানের চরম শক্তির প্রকাশের সঙ্গে তার প্রভুভক্তির নিদর্শন। সব মিলিয়ে এক মহাকাব্যিক বাতাবরণ তৈরি হয়। সুকুমার তাঁর সহজাত ভঙ্গিমায় হাস্যরসের অফুরান প্রবাহে মহাকাব্যের চরিত্রদের 'ভেতো বাঙালি' 'ভীতু বাঙালি' করে ছেড়েছেন।

বেশিরভাগ সমালোচকের আলোচনায় সুকুমার রায় হাসির লেখক হয়েই রয়ে গেছেন। এমন ভাবনা উসকে দিতে দুই বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী এবং লীলা মজুমদারেরও কিছু অবদান আছে। পুণ্যলতা তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে লিখছেন—

'এতদিন ছোটদের জন্য সে সব নাটক ও গল্প বইয়ে কিংবা পত্রিকায় বেরোত, তাই নিয়েই অভিনয় হত, এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল।'

নাটক অভিনয় করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই সুকুমার নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম রচিত নাটক অবশ্য 'রামধন বধ'। এটিও হাসির নাটক। র‍্যামসডেন সাহেবই আসলে রামধন সাহেব। নকল সাহেবিয়ানা, নকল প্রতিপত্তি—এ নাটক পাড়ার ছেলেদের হাতে পড়ে রামধন সাহেবের চূড়ান্ত লাঞ্ছনার নাটক। ১৯০৫ সাল নাগাদ রচিত এই নাটকে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মৃদু আভাস পাওয়া যায়। যেটা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ প্রায় লক্ষ করা যায় না।

অন্য এক প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার বলেছেন—ছেলেমানুষ বয়সেই তিনি 'রামধন বধ' লিখছেন। আরও বছর দুয়েক বাদে, তার মানে ওই ছেলেমানুষ বয়সেই তিনি লিখছেন 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। আপাতদৃষ্টিতে সবই মজার নাটক এবং হাসিরও বটে। সকলেই সুকুমারের হাসির কথা উল্লেখ করেছেন। যেন হাসি এবং মজা করাটাই এই নাটক রচনা এবং অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এমন ভাবার পেছনে সুকুমার রায়ের 'ছেলেমানুষ' বয়সটাও দায়ী। তখন তাঁর বয়স আঠেরো-উনিশ। যে বয়স গভীর চিন্তা করা থেকে চিন্তককে বিরত রাখে, যে বয়সে রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসার কথা নয়। এই কথার সমর্থন পাই লীলা মজুমদারের একটি মন্তব্যে। তিনি জানাচ্ছেন (সুকুমার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-১৯৮৯), 'সুকুমার প্রত্যক্ষভাবে সবরকম রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে থাকতেন।' এরপরেই তিনি আবার বলেছেন—'তাই বলে যে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন না, একথা মনে করা ভুল।' কিন্তু আমাদের মুশকিল হল, এই ভুলটাই আমরা বেশি করে বয়ে বেড়াচ্ছি। আগেই বলেছি আঠেরো-উনিশ বছর বয়সটাকে ছেলেমানুষ বয়সই বলা যায়। ওই বয়সের রচনায় আমরাও তাই শুধু ছেলেমানুষীই খুঁজেছি— সেই সেই ঘটনা, সেই সেই চরিত্র যা ছোটদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। নাটক জুড়ে তাই সরস সংলাপ, লম্ফঝম্ফ এবং সরল এক গল্পের বিস্তার। এতে হাসি আসবেই। কিন্তু মঞ্চের এই হাসির আয়োজনকে একপাশে সরিয়ে আমরা যদি নাটকের গ্রিনরুমে একবার উঁকি দিই তবে এক অন্য দৃশ্য, অন্য অনুভব পাওয়া সম্ভব।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে

নাটক অভিনয় করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই সুকুমার নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম রচিত নাটক অবশ্য 'রামধন বধ'। এটিও হাসির নাটক। র‍্যামসডেন সাহেবই আসলে রামধন সাহেব। নকল সাহেবিয়ানা, নকল প্রতিপত্তি—এ নাটক পাড়ার ছেলেদের হাতে পড়ে রামধন সাহেবের চূড়ান্ত লাঞ্ছনার নাটক। লীলা মজুমদার বলেছেন, ছেলেমানুষ বয়সেই তিনি 'রামধন বধ' লিখছেন।

সুকুমার রায় ২০১৩

বিভীষণের ঘুম

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, 'দেখো যেন ঘুমিও না'—বাপু, এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি।

(পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি)

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার কিছু কিছু ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়ত বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।... যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের ত ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা ত আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

(উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ)

জাম্বুবান। দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্।

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিয়া) কেরে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করিছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোইনি।

জাম্বুবান। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, 'সত্যি করে ঘুমোইনি।'

বিভীষণ। তুই টের পাসনি?—আমি মিট্‌মিট্ করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান। না না—মিট্‌মিট্ করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে। (প্রস্থান)

বিভীষণ। ব্যাটা ত ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

(পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা)

সুকুমার রায়ের রচনাগুলির ক্ষেত্রে বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

জানা যায় না। তবে বিভিন্নজনের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৯০৭ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে যে কোনও একটি সময়ে নাটকটি লেখা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে সময়টা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৯০৫-এ বঙ্গবিভাগের ব্যবস্থা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই সময়েই বয়কট আন্দোলন দেশময় দৃপ্ত রব তুলেছিল। এর সঙ্গে ছিল স্বদেশি বাণিজ্যের উন্নতি কামনার সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্রতা। এই সালেই কংগ্রেসের 'স্বদেশি' সমর্থনের ফলে এই আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই পর্বেই ইংরেজ শাসক তৈরি করছে রাজদ্রোহ আইন, সংবাদপত্র দলন আইন, কংগ্রেসে উগ্রপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদও তৈরি হচ্ছে।

একদিকে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করছে। অন্যদিকে ইংরেজ শাসক সরকারি চন্দ্রনীতি প্রয়োগ করে অত্যন্ত সহজেই আন্দোলনকে ছত্রখান করে দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই 'প্রস্তুতি পর্ব' সুকুমার রায় বিশেষ সংখ্যায় পুলক চন্দ লিখেছেন—'একদিকে স্বদেশিদের অস্বাভাবিক আস্ফালন ও নিস্ফলতা অপরদিকে ধৈর্যভ্রষ্ট ইংরেজের হাতের 'লগুড়' ইত্যাদি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতির একটা তিক্ত কৌতুকময় দিক কি সুকুমারের চোখে ধরা পড়েছিল? শক্তিশেলের সঙ্গে দমন-মূলক আইন বা অন্যকিছুর আপাত সাদৃশ্য সম্ভবত প্রথমে তাঁর মনে এসেছিল তারপরেই সম্ভবত জেগেছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ব্যাঙ্গাত্মক ভাষ্য তৈরির বাসনা।'

বয়কট এবং স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে কিছু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই যখন গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, তখন ওই মুষ্টিমেয় ব্যাতিক্রমদের মধ্যে সুকুমার রায়ও ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি সুকুমার প্রত্যক্ষভাবে সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে থাকতেন। ভাগ্যিস বাইরে থাকতেন! তাই তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। তাই স্বদেশি আন্দোলনে যখন চারদিক তোলপাড় তখন কয়েকজন মুষ্ঠিমেয়র মধ্যে সুকুমারও বুঝেছিলেন আন্দোলনে যতখানি আবেগ আছে ততখানি পরিকল্পনা নেই। আন্দোলন থেকে দূরত্বের কারণে তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। তাই তিনি কোনও পক্ষপাতিত্ব করেননি। রামকে স্বদেশি এবং রাবণকে বিদেশি কল্পনা করা ছিল স্বাভাবিক। নাটকে খুব সূক্ষ্ম ভাবে এর ইঙ্গিত দিয়েছেন সুকুমার।

ইঙ্গিতগুলো এরকম :

বিশল্যকরণী প্রয়োগের ফলে লক্ষ্মণের চৈতন্য লাভ। এসময় হনুমান বলছে, 'হাজার হোক স্বদেশী ওষুধ তো'। সকলে আশ্বস্ত হল, 'তাই বল। স্বদেশী না হলে কি এমন হয়?' স্বদেশির প্রতি রাম-এর পক্ষের এই অনুরাগ এবং বিশ্বাস তাদের চরিত্রের রাজনৈতিক দিক স্পষ্ট করে।

অন্যদিকে রাম স্বদেশি হলে রাবণ বিদেশি। এখানেও দু-একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন সুকুমার। যেমন রাবণ বলছে—

আমি পালোয়ান স্যান্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরোপাট্‌কিন্
কোথায় রোজেদ্‌ভেনিস্কি।

এখানে বিদেশি পালোয়ান স্যান্ডো-র সঙ্গে শুধু নয়, রাবণ নিজেকে কুরোপাট্‌কিন্ এবং রোজেদ্‌ভেনিস্কি'র সঙ্গেও তুলনা করেছে। ওই দু'জনেও ইতিহাসের মানুষ। ক্ষেত্র হল ১৯০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেই মাঞ্চুরিয়ার রুশ সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী অ্যালেকিস কুরোপাট্‌কিন আর অ্যাডমিরাল রোজেদ্‌স্তভেনস্কি ছিলেন বাল্টিক নৌবহরের কম্যান্ডার। অর্থাৎ ওই নামগুলি ব্যবহার করার পেছনে রাবণ কোন পক্ষভুক্ত তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

এই হিসেবে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-কে এক বহুমাত্রিক রচনা বলা যায়। কাহিনি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে অন্য এক গূঢ় ইঙ্গিত দিচ্ছে এ রচনা। উত্তর-আধুনিক সময়ের রচনায় অজস্র চোরাটান, স্ববিরোধিতা, বিপ্রতীপ অন্তর্ঘাত মত ভারী ভারী শব্দবাহিত সংকেতময় উদ্ভাস না থাকলেও যা আছে তা দিয়েও নতুনভাবে বিনির্মিত হতে পারে আমাদের অতিপরিচিত এই নাটকটি। ❖

তথ্যসূত্র : সুকুমারের নাটক : পুলক চন্দ : প্রস্তুতি পর্ব, বিশেষ সংখ্যা

সুকুমার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৯

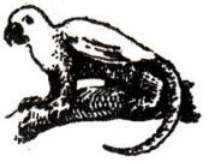

১৯০৭ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে যে কোনও একটি সময়ে নাটকটি লেখা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে সময়টা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৯০৫-এ বঙ্গবিভাগের ব্যবস্থা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই সময়েই বয়কট আন্দোলন দেশময় দৃপ্ত রব তুলেছিল। এর সঙ্গে ছিল স্বদেশি বাণিজ্যের উন্নতি কামনার সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্রতা।

সুকুমার রায়ের হযবরল-এর চরিত্রগুলি কি নেহাতই কাল্পনিক আর মজার! এইসব চরিত্রগুলির নির্মাণে কি আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না লেখকের? প্রশ্নগুলো সকলের মাথাতেই আসে। **হ্যাঁ, ছিল। মজার মোড়কে প্রতিটি চরিত্রের আড়ালে একটি করে অন্য চরিত্রকে এঁকেছিলেন সুকুমার।** সেই সব চরিত্ররা আগেও ছিল এখনও আছে। **হযবরল**-র খেই ধরেই একবার তাদের আসল রূপগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করলে কেমন হয়? মিলবেই এমন গ্যারান্টি নেই। তবে মিলতেও তো পারে। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

১. **বিড়াল**—মনুষ্যসমাজে এ এক অদ্ভুত শ্রেণি যাদের নিজস্ব কোনও আইডেনটিটি নেই। অথচ তাদের কোনও আইডিনটিটি ক্রাইসিসও নেই। বরং সুযোগ বুঝে নিজেকে চট করে বদলে ফেলার খেলাকে তারা যথেষ্ট উপভোগ করে। এবং এই রূপান্তরের জন্য তাদের কাছে সবসময়েই যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সে যুক্তি যতই দুর্বল হোক না কেন তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টায় ত্রুটি রাখে না তারা। সমাজে রাজনীতির খেলোয়াড় যারা তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই এই 'বিড়াল' রূপটি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'বিড়াল তপস্বী' নামক প্রবচনটি স্মরণে আনা যেতেই পারে। তবে তেমন ফ্যাসাদে পড়ে নিজের উদ্ধারে ব্যর্থ হলে এরা তখন এদের সুপ্রিমো গেছোদাদাদের শরণাপন্ন হয়।

২. **গেছোদাদা**—তিনি আছেন অথচ নেই। জনগণের পক্ষে তাঁর নাগাল পাওয়া ভারী কঠিন। কিন্তু তাঁর নজর নাকি সর্বত্র। অনেকটা দেশের মন্ত্রীমশাইদের মতো। থেকেও নেই। যদিও তাঁর একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান রয়েছে গাছ (পার্লামেন্ট কিংবা অ্যাসেম্বলি)। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়েও তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। জনসাধারণ তো কোন ছাড় বহুরূপী বিড়ালরাও অনেক সময় তাঁদের দেখা পান না। তাই তাঁকে কোথায় দেখা যেতে পারে তার জন্য বিস্তর আঁক বা ছক কষতে হয়। মোদ্দা কথা, পরিকল্পনা করতে হয়।

৩. **শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে**—এরা হলেন সেই বেনিয়া শ্রেণি যাঁরা নিজেদের মুনাফার জন্য গোটা দেশ জুড়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের প্রচার চালান। এবং সাধারণ গ্রাহকদের হাবিজাবি উলটো পালটা বুঝিয়ে দিগভ্রান্ত করে নিজের ব্যবসাটি দিব্বি চালিয়ে যান। বিজ্ঞাপনে এঁরা জানান তাঁরাই সব থেকে সেরা। তাঁদের প্রডাক্টই সব থেকে উৎকৃষ্ট। এঁদের ছলচাতুরির ফাঁদে পড়ে নাকাল হয় উদোবুধোর মতো আম জনগণ। সব থেকে সুবিধাবাদী শ্রেণি হিসেবে এঁরা চিহ্নিত। উধোবুধোর মতো জনগণকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে ফায়দা লোটেন এঁরা।

৪. **উধোবুধো**—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ানো ছাপোষা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যাদের প্রত্যাশার বৃত্ত কখনওই পূর্ণ হয় না। এদের উত্থানও নেই পতনও নেই (তাই এদের বয়স একবার চল্লিশ থেকে দশ আবার দশ থেকে চল্লিশ)। মাঝখান থেকে ব্যাসার্ধ এঁকে যায় কাকেশ্বররা। পকেটের কড়ি জলাঞ্জলি দিয়েও যাদের হাতে হাতে পড়ে থাকে ভগ্নাংশ মাত্র। কে ভুল আর কে ঠিক তা নিয়েই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরে। ফলে উধোর বোঝা একবার চাপে বুধোর ঘাড়ে আর একবার বুধোর বোঝা উধোর ঘাড়ে।

৫. **ন্যাড়া**—এদের ডেস্টিনিই হল এরা সবসময় ভিকটিম। সমাজের সবস্তরের মানুষের মধ্যেই এই 'ন্যাড়া' শ্রেণি রয়েছে। তাই ন্যাড়া হওয়া সত্ত্বেও এরা বারবার বেলতলায় যায়, এবং বেলও প্রতিবারই এদেরই মাথায় পড়ে। সমাজের যে কোনও অপরাধে এরাই নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত দোষী বা আসামি সাব্যস্ত হয়।

৬. **শেয়াল ও কুমির**—বর্তমান বিচার ব্যবস্থাকে এরাই প্রহসনে পরিণত করেছে। আইনের নানা ফাঁকফোকর বার করে তাকে কাজে লাগিয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে এদের জুড়ি নেই। আইনের ফাঁকের পুরো সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করে এরা। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নির্দোষকে দোষী বানিয়ে তাকে ফাঁসির সাজা দেওয়াতেও এদের বিবেকে আটকায় না।

৮. **ব্যাকরণ সিং**—দেশের এক শ্রেণির শিক্ষাবিদ। এদের কাজ শুধু সক্কলকে নিজের ছাত্র ভেবে এন্তার আবোলতাবোল বক্তিমে করা এবং মাথামুন্ডুহীন ছাইপাঁশ বোঝানো। বুদ্ধিতে ছাগলবৎ হলেও শিক্ষায় প্রাপ্ত ডিগ্রিটি নিজের নামের আগায় কিংবা গোড়ায় বসিয়ে বিদ্যে জাহির করতে এদের জুড়ি নেই।

৭. **প্যাঁচা**—বর্তমান অসার বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধি। চোখ বন্ধ করে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় এঁরাই আছেন। যদিও দেশের সংবিধান এবং আইন রক্ষা করার দায়িত্ব এঁদের হাতেই, তবু তাঁদের উদাসীনতার কারণে অনেক সময় শিকার হয় ন্যাড়াদের মতো নিরপরাধরা।

৯. **হিজিবিজবিজ**—মানুষের চিরকালের দর্শন, যে সমাজের সমস্ত অন্যায়, ক্লেদ, বৈষম্যকে দেখে হাসে। শুধু হাসে। সে হাসতে হাসতে বলতে পারে 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেররই চোখে ব্যারাম'। এই হাসি আসলে ব্যাঙ্গের। আর মানুষের বিবেকের তো কোনও অন্য নাম হয় না। তাই হিজিবিজবিজের বাবার, ভায়ের, পিসের সবার নামই হিজিবিজবিজ।

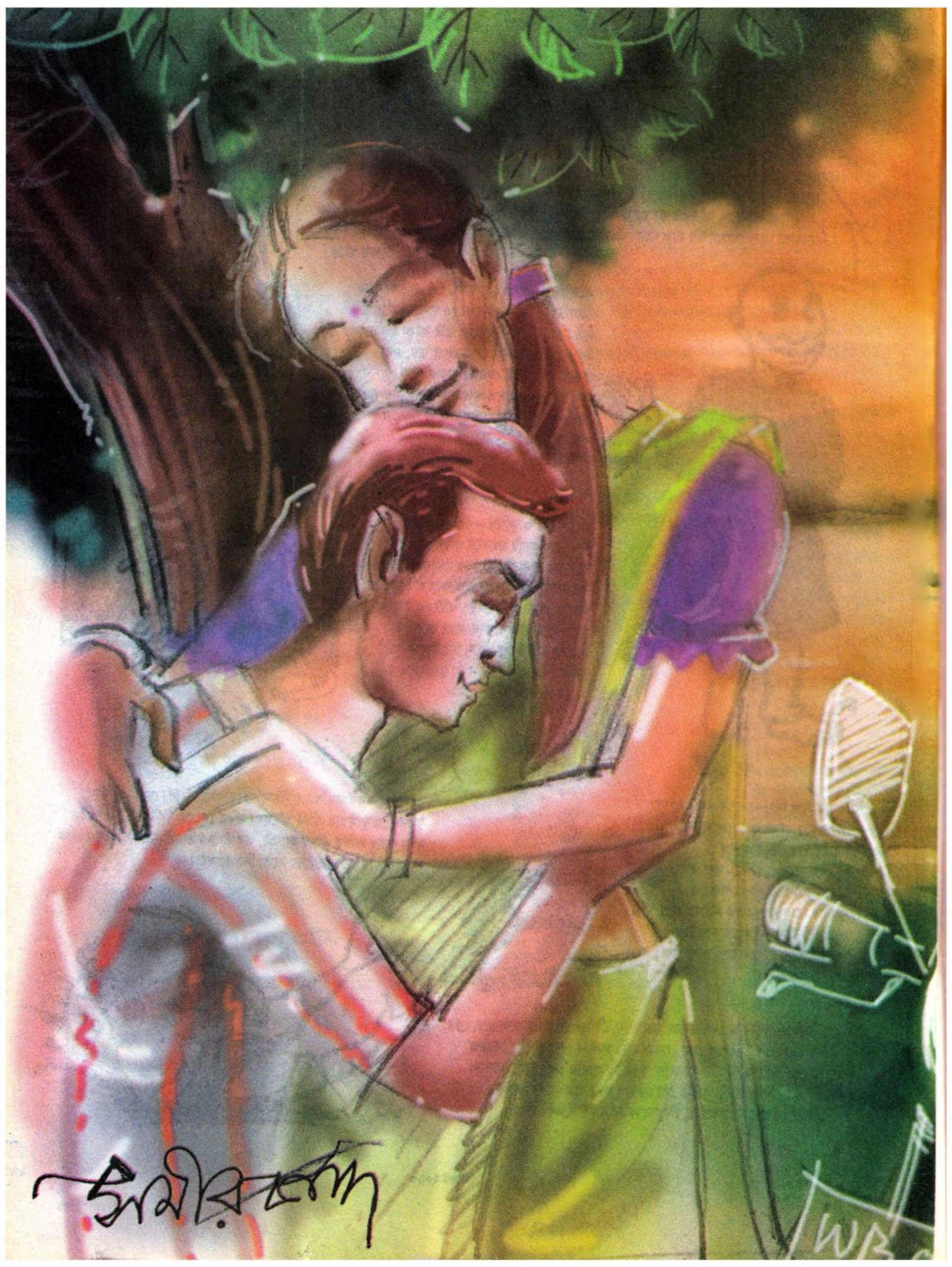

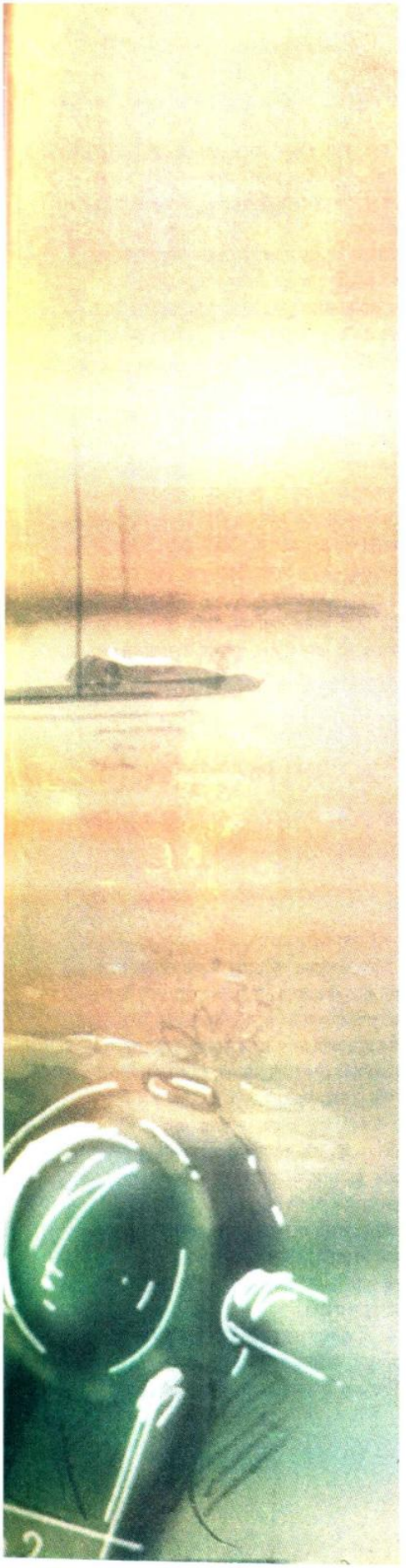

শুভলগ্ন

ঈশা পাল

সমস্ত শরীর জুড়ে আমার কাশফুলের বনে প্রবেশ করার অনুভূতি। এখনও! এতদিন পরও! স্টেশনে পা দিতেই সব এক। সেই গন্ধ। সেই রূপ। বদলায়নি রামনগর। পনেরো বছর পরও সেই ঢিমেতালের মফস্‌সল।

সকাল ন'টাতেই ফাঁকা ফাঁকা স্টেশন। কান পাতলে রেডিয়োর ভাষ্য এবং গান। আকাশ অনেক দূর অবধি দৃশ্যমান...উদাস করে দেওয়া হাওয়া।

বিতানের কোলে ঝুম আর আমার হাতে ধরা তাতা। কিন্তু আমার হাত অসার লাগছে। তাতার কচি হাতটার কোনও স্পর্শানুভূতিই যেন নেই। একটা পুরোনো ঝিমঝিমানি আবার ফিরে আসছে। পনেরো বছর আগের মতো। চিনতে পারবেন তো আমাকে তিনি? ক্ষমা করবেন তো? আমি ট্রলি ব্যাগটা টানতে টানতে তাতাকে নিয়ে এগোই। দেখি বিতান দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্যুটকেসটা রেখে, স্টেশনের কোণে গরম জিলিপি আর কচুরি ভাজা হচ্ছে মধুর গন্ধ ছড়িয়ে। আমি দোকানদারের দিকে তাকাই। নাঃ। সেই বুড়োটা নয়। এ একটা অল্পবয়সি ছেলে। শব্দ করে মিলিয়ে গেল ট্রেনটা আর পনেরো বছর আগেকার পুরোনো অভ্যেস মুহূর্তে ফিরে আসে আমার। রেললাইনের ওইপারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার দুটো চোখ। আর অবাক হয়ে দেখি একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি রামনগর বালক বিদ্যালয় আর বালিকা বিদ্যালয়। দুজনেরই গায়ের হলুদ রং এখন ফ্যাকাশে সাদা। তবু আছে। পাশাপাশি আমার আর রঞ্জনের মতো আলাদা হয়ে যায়নি।

জিলিপি দোকানের ছেলেটি বিতানকে বেশ যত্ন করে জিলিপি দেয়। আমরা এখন এখানে প্রায় আগন্তুক। বিতানের চেহারায় নিখুঁত কর্পোরেট লাইফের ছাপ। ফর্মাল শার্ট আর টাইট জিনস। বিদেশি সৌরভ। চুলে বার্গেন্ডি কালার। আমার মেয়ে ঝুম তিন বছরের। দামি ফ্রক গায়ে। তাতা ছয়। জিনসের প্যান্ট-জ্যাকেট। আমিও আর দুই বেনী করা, কানে সোনার রিং পরা মৌমিতা নই। বিতানের সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরে ঘুরে আমি এখন ফ্যাশন সচেতন এক নাগরিক মহিলা। ছোট করে কাটা চুল, দামি ঘড়ি, হিরের দুল—যা সবই এই মফস্‌সলে অভিনব, অদ্ভুতও। আমার চিরকালের ফরসা রং, নির্মেদ কোমরে নাগরিক ঘষামাজার ছাপ।

বিতান জিলিপি কিনে তাতার হাতে ঝুলিয়ে দেয়।

বেশ লঘু মুডে হাঁটছে। দিল্লি-মুম্বই করতে করতে সত্যিই হাঁফিয়ে উঠেছে হয়তো। তাছাড়া প্রথাগত ভাবে শ্বশুরবাড়ি আসা যাকে বলে। একটু অন্যরকম লাগছে নিশ্চয়ই ওর। আমাকে বলে—কোথায় গাড়ি? গৌরাঙ্গদাদু কোথায় দাঁড়াবে?

আমি বাসস্ট্যান্ডের দিকে দেখাই। ঠিক কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

পনেরো বছর আগে নভেম্বর মাসের সতেরো তারিখের পর এই এলাম। ভেবেছিলাম ভুলে গেছি সব। বুঝতেই পারিনি রঞ্জন এখনও এত টাটকা আমরা মনে। আমরা হাঁটছি বাসস্ট্যান্ডের দিকে আর আমি যেন ডুবে যাচ্ছি। স্মৃতিতে। সাইকেল স্ট্যান্ডটার দিকে তাকাচ্ছি, যেখানে রঞ্জন বাইক রাখত, ছোট্ট সিগারেটের গুমটিটা যেখানে সিগারেট কিনত—সেটা এখন বেশ বড় বড় ঠান্ডা পানীয়ের দোকান। আর ডানদিক দিয়ে ওদের বাড়ি—যেটাকে লোকজন রাজবাড়ি বলত—সেদিককার রাস্তাটা পাকা, বাঁধানো।

আমার ইচ্ছে করত, রঞ্জন আমাকে 'রানি' বলে ডাকুক। কিন্তু কোনওদিন ডাকেনি। ও নাকি ন্যাকামি করতে পারত না।

আমার বলতে ইচ্ছে করত, ন্যাকামির কী? রাজবাড়ির বউকে তো লোকে তাই বলবে। বলতে পারতাম না। রঞ্জনকে আমি ভয় পেতাম। ওর রাগকে, ওর ভালবাসাকেও।

আমি তখন শুধু স্বপ্ন দেখতাম। ওদের বাড়ি নিয়ে, ওকে নিয়ে, আমাদের ভবিষ্যতের সংসার নিয়ে।

গৌরাঙ্গদাদু আমাদের দেখে এগিয়ে আসে। বিতানের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসে—কষ্ট হয়নি তো জামাই? বিতান স্বভাবসিদ্ধ উজ্জ্বল হাসে—একটুও না।

দাদুকে বিতান চেনে। কাকামণির গাড়ি চালায়, তাছাড়া বাবার যাবতীয় কাজের ডানহাত। প্রায়ই বাবা-মার কাছে কলকাতা যায়, আমাদের বাড়িও যায় সময় পেলে। কাকামণিদের সঙ্গেও আমাদের প্রায়ই দেখা হয়। শুধু অদেখা থেকে গেছে রামনগরটাই, আমাদের আসল বাড়িটাও।

ঝুম আর তাতাকে কোলে নিয়ে আমরা বসি। কাকামণি গাড়িটা বদলে ফেলেছে। এটা ছোট গাড়ি। আরও একবার মনে পড়ে যায়, আমাদের যৌথ পরিবার দ্রুত ভেঙে ছোট হয়ে যাওয়াটা। সেটাও কি রঞ্জনের কারণে নয়?

সেই সতেরোই নভেম্বর রাতে আমাকে নিয়ে প্রায় একবস্ত্রে বাড়ি ছেড়েছিল বাবা-মা। শ্রীরামপুরে মামার বাড়ি দু'মাস থাকার পর রাতারাতি দমদমে ফ্ল্যাট কিনেছিল বাবা। আমার তখন রীতিমত চিকিৎসা চলছে। সঙ্গে কাউন্সিলিং।

বাড়িটার চারপাশও বদলে গেছে বেশ। অনেক বাড়ি হয়েছে এদিকে। আমাদের গমগমে বাড়িটা কী নির্জন! বুম্বাটাও বেঙ্গালুরুতে পড়ছে। আগে দোতলায় মা-বাবার সঙ্গে আমি থাকতাম। এখন দোতলাটা তালাবন্ধ থাকে নাকি! আজকে বহুদিন পর খুলে পরিষ্কার করা হয়েছে। আর যেন পনেরো বছরের পুরোনো গন্ধগুলো আমাকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে। হুড়মুড় করে ফিরে আসছে আমার কিশোরীবেলা। মা-বাবাকে লুকিয়ে, সন্ধেবেলায় পড়তে বসে কত চিঠি লিখতাম! রঞ্জনকে নয়—ওকে নিয়ে মৌসুমীকে, রুনুকে, চন্দনাকে। সন্ধেবেলার অনুভূতিটা সকালবেলায় উঠে একটুও বোকা বোকা লাগত না। রঞ্জন ছাড়া নিজেদের মধ্যে মান-অভিমানগুলোও লেখা হত টুকরো কাগজে।

চারপাশের পৃথিবীটা তখন যে কী গভীর রোমাঞ্চময়! নির্জন স্টেশনের ধারে ধর্ষিতা হয়েছিল একটি মেয়ে। তার তীব্র কান্না আমাদের বাড়ি অবধি এসে পৌঁছেছিল। লোকজন গিয়ে পেয়েছিল রক্তাক্ত, অর্ধমৃতা একটা মেয়েকে। সেই কান্নার আওয়াজ যে কতদিন আমাকে ঘুমোতে দেয়নি! সিপিএম এবং কংগ্রেসের উত্তপ্ত মিছিল বেরোত যখন তখন। দে-পাড়ার একটি মেয়েকে কে বা কারা মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারল একদিন। খুব বিচলিত হয়ে পড়তাম আমরা এসবে। যদিও আমার জীবনে তখন মাধুর্যের ফোয়ারা। রঞ্জনের মতো দামাল ছেলেটার প্রেম আমাকে যাবতীয় টেনশন থেকে দূরে সরিয়ে রাখত।

বুঝতে পারিনি বোধহয়, রঞ্জন উপুড় করে দিয়ে দিচ্ছে। পরে আর কিছু দেবে না বলে।

বুঝলে হয়তো এত বড় ক্ষতিটা হত না। ক্ষতি? মা আর বাবা তখন সমানে কানের কাছে বলে গেছেন—তুই বেঁচে গেলি! ওরকম একটা ছেলের হাতে পড়লে যে তোর কী হত! ও তো কারওর কথা ভাবে না।

আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই তোকে দোষী করেছিল, অন্তত আমার সামনে। কিন্তু ওদের কথা আমার কানে ঢুকত না। আমার বারংবার মনে পড়ত একটা দিনের দৃশ্য। সব স্মৃতি ছাপিয়ে জ্বলজ্বল করত ওই দিনটা।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমরা চলে গেছিলাম রামনগর শ্মশানের তীরে। নির্জন হলেও প্রেমিক-প্রেমিকারাও যেত না ওখানে। কিন্তু চিরকালের দামাল তুই। বাইকের পিছনে আমাকে বসিয়ে পাড়ি দিতিস যেখান সেখান। আর ময়ূরাক্ষীর তীরে শ্মশানটা কেন জানি না তোকে টানত। প্রাথমিক আদরের পর চুপ করে বসেছিলি সামনে সরু হয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে তাকিয়ে। খুব বেশি প্রেমের কথা জোগাত না তোর মুখে কোনদিনই। শুধু যখন শরীর দিয়ে আদর করতিস, আমি টের পেতাম আমাকে তুই ভালবাসিস, খুব খুব ভালবাসিস। এ শুধু শরীরের আদর নয়।

সেদিন শ্মশানের পরিবেশে, নির্জন নদীটার ধারে একটা শীত শীত আধা বিকেলে আমরা একটু উদাস হয়ে গেছিলাম। হঠাৎ করেই আমার দিকে ফিরলি। অবাক হয়ে আমি দেখি, তোর দু'চোখে টলটলে জল। ওই একবারই তোর চোখে দাপট, রাগের বদলে জল দেখেছি। তোর কৃষ্ণঠাকুরের মতো দুষ্টুমিষ্টি মুখখানা কী করুণ! তুই পুরো অচেনা একটা গলায় বললি—মৌ, তুই আমার মা হতে পারবি তো? আমার মা আমাকে যেমন ভালোবাসত, তেমন ভালোবাসতে পারবি তো?

আমি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। সদ্য চুম্বনের পর আমার কিশোরী ঠোঁট তখনও কাঁপছে। আমি উত্তর দিতে পারিনি। সতেরো বছর বয়সটা যে মা হবার জন্য বড় কম ছিল!

— কী ব্যাপার বলো তো? এতদিন পর বাড়িতে এসে পুরো নস্ট্যালজিক হয়ে গেছ যে!

বিতান কাকিমার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমার

নির্জন স্টেশনের ধারে ধর্ষিতা হয়েছিল একটি মেয়ে। তার তীব্র কান্না আমাদের বাড়ি অবধি এসে পৌঁছেছিল। লোকজন গিয়ে পেয়েছিল রক্তাক্ত, অর্ধমৃতা একটা মেয়েকে। সেই কান্নার আওয়াজ যে কতদিন আমাকে ঘুমোতে দেয়নি!

দিকে তাকিয়ে হাসে।

কাকিমাও হাসে—কতদিন পর এলি বল তো?

আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কাকিমা না আসার কারণটা ভুলে গেছে কি না।

—ঝুম, তাতা কি গরম জলে চান করবে?—কাকিমা প্রসঙ্গ ঘোরায়—কল্পনাকে চান করিয়ে দিতে বলি ওদের, জলখাবার খাওয়া হলে, তুইও হাত-মুখ ধুয়ে নীচে আয়। চা-টা খা।

আমি পায়ে পায়ে হাঁটি। পুরোনো লাল সিমেন্টের মেঝেটা ঠান্ডা হয়ে আমার পায়ে বাজে আর আমার পা হয়ে যায় সতেরো বছরের। কিশোরী দোলায় আমি ঘুরি। বিতান আমার দিকে তাকায়। আর হাসে। আমি একা হয়ে ঘুরে বেড়াই।

আমাদের গার্লস স্কুল-বয়েজ স্কুল ছিল পাশাপাশি। ছেলেরা জানলা দিয়ে, ছাদ দিয়ে কতরকম ভাবে যে টার্গেট করত আমাদের!

— দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে বিতানকে গল্প করি। আমার আসলে কারওর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল। আমাদের ছোটবেলার কথা, রামনগরের কথা।

— তোমার মতো সুন্দরীকে নিশ্চয়ই প্রচুর জন টার্গেট করত?

— হ্যাঁ...। প্রচুর চিঠি পেয়েছি সেভেন-এইট থেকে। আর তাই-ই তো...বলেই আমি থেমে যাই। বাক্যটা সম্পূর্ণ করি না।

বিতান খুব আধুনিকমনস্ক শিক্ষিত ছেলে। বউয়ের পুরোনো প্রেম নিয়ে মাথাই ঘামাবে না। ওকে গল্পচ্ছলে রঞ্জুর কথা বলাই যায়। কিন্তু বুঝবে কি? না বুঝলে যে আমার রঞ্জুকে আমি অপমান করতে পারব না।

—জানো তো, বয়েজ স্কুলের ছেলেরা একবার আমাদের সরস্বতী পুজোর সময় লাইন দিয়ে ভোগ খেতে এল। বড়দিদিমণি তো রেগে গজগজ করছেন। এদিকে কিচ্ছু বলতে পারছেন না...

—আমাকে একটা গায়ে দেওয়ার কিছু দেবে? বেশ ঠান্ডা লাগছে এখানে। বিতান পাশ ফিরে শোয়।

আমি নীরবে একটা বালাপোষ এনে বিতানকে দিই। তাতা আর ঝুমের দু'পাশে বালিশ দিয়ে গুছিয়ে দিই। নীচে এসে দেখি কাকিমা পান সাজছে, কাকামণি পেপার পড়ছে। কল্পনা রান্নাঘরে ভাত খাচ্ছে।

কাকামণি আমাকে দেখে ডাকে—কীরে, একটু শুলি না? আয়, বোস।

আমি বসি না। কাকামণিকে বলি—কাকামণি, আমার সাইকেলটা কোথায় বলো তো?

ওঁরা দুজনেই অবাক হয়ে তাকায়। বারণ করতে গিয়েও করে না। বোধহয় মনে পড়ে যায়, পনেরো বছর আগে সাইকেল নিয়ে বেরোতে গেলে যে কারণে বারণ করত এখন সেই কারণটাই নেই। কাকামণি সিঁড়ির ঘরের দিকে তাকায়।—ওইখানে আছে। গৌরাঙ্গর নাতনিটা মাঝেমধ্যে চালায়। কোথাও যাবি?

—একটু চন্দনাদের বাড়ি ঘুরে আসি।

—ওমা! চন্দনারা এখন কোথায়! কাকিমা সুপুরি কাটতে কাটতে ফিরে তাকায়—কবে সব বাড়ি বিক্রি করে চন্দননগর চলে গেছে। চন্দনা তো বিয়ে করে জলপাইগুড়ি না কোথায় যেন!

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ি। বেশ মনখারাপ লাগে। রামনগরের আকাশ বাতাসই শুধু এক আছে। কখন যে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে এই শহর থেকে আমার ছোটবেলাটা!

সিঁড়ির ঘর থেকে সাইকেলটা বার করি। বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলি—দেখে আসি একবার শহরটাকে...অন্তত রঞ্জনদের বাড়ি তো একবার যাই!

কাকামণি-কাকিমার হতভম্ব মুখের দিকে আর ফিরে তাকাই না...আমার ছোটবেলার শহরটাতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি আমার কিশোরীবেলার সাইকেলটা নিয়ে...আর সাইকেল চালাতে চালাতেই টের পাই, একা নই। সাদা টি-শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরে রঞ্জন আমার সঙ্গে চালাচ্ছে। গোটা শহরটা আমাদের দিকে তাকিয়ে। আগের মতোই। মোহনা বলত—'কী মানায় রে তোদের দুজনকে! আমার সঙ্গে এত মানায় না।' এই মোহনাই রঞ্জনের জন্য একসময় পাগল ছিল। রঞ্জন কোনওদিন পাত্তা দেয়নি, কিছু বলেওনি। জিগ্যেস করলেই মুখ টিপে হাসত আর আমার গা জ্বলে যেত হিংসেয়।

সাইকেলটাই যেন আমাকে কখন নিয়ে চলে গেছে—রেললাইনের ওই পারে—আমাদের দুটো স্কুল বাড়ির সামনে। এখন ক্লাস চলছে। একটা ঠান্ডা নিস্তব্ধতা আর সাদা নীল ইউনিফর্মের আভাস। আমি গার্লস স্কুলের খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়াই—একটা দোতলা বাড়ির আড়ালে। প্রাণ ভরে দেখি স্কুল দুটোকে। এখনও একই রকমভাবে তেরছা করে রোদ পড়েছে কার্নিশে, টুয়েলভ বি সেকশনের ঘর থেকে এখনও দেখা যায় বয়েজ স্কুলের করিডরটা। বোধহয় স্কুল দুটোও আমাকে দেখছে স্মৃতির পর্দা সরিয়ে। দু'চোখে ওদের যেন টলটলে আশঙ্কা—রঞ্জনকে

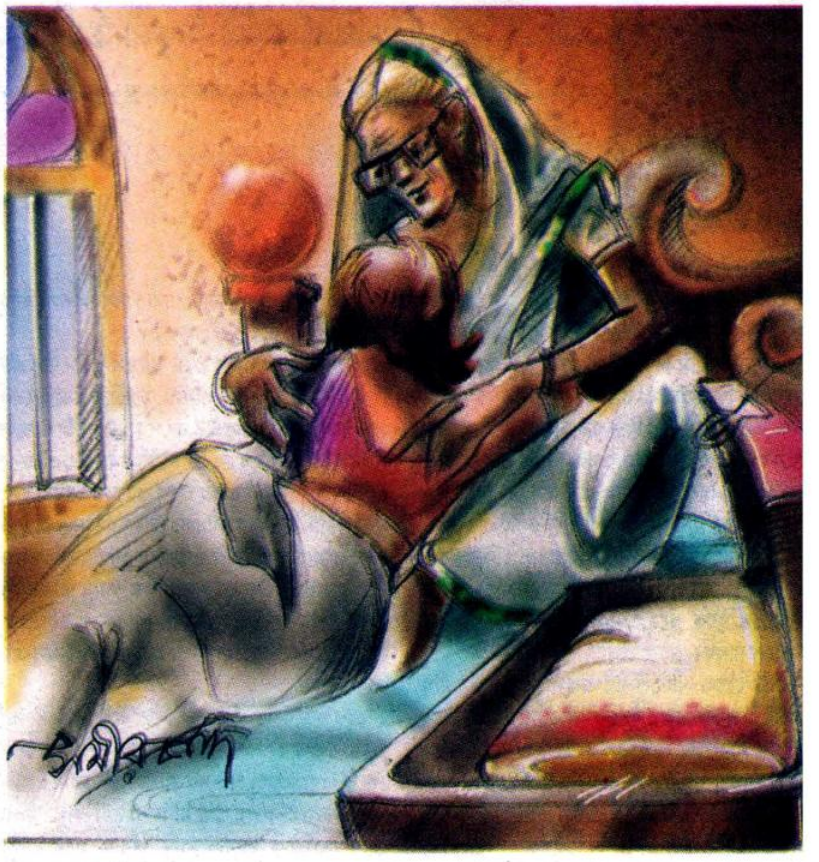

হারিয়ে আমি ভালো আছি তো?

দুই

মাত্র মাস দুই আগে মৌসুমী আমাকে ফোন করেছিল। উনি নাকি আমাকে দেখতে চেয়েছেন। প্রায় দু'বছর আগে থেকেই মৌসুমী জেনেছে এ কথা। কিন্তু আমার পাত্তা পায়নি ও! আমি তো জানি, দু'বছর নয়, পনেরো বছর ধরেই আমাকে খুঁজছেন উনি। আমি তো পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলাম, সামলেছিলাম এ শোক। উনি কেমন করে সামলালেন?

এখনও বাড়িটা সেই একইরকম। বিরাট, মহৎ—রাজকীয়। শুধু বাগান থেকে বাড়িটার ইটের গাঁথনিগুলো অবধি থমথমে—রঞ্জনের স্মৃতিতে। রাজপুত্র হারা রাজবাড়ির মত কান্নাতুর...

এই বাড়িতে তখন ওরা তিনজন। রঞ্জু, বাবা আর দিদু। বাবা কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। রঞ্জু তো টো টো করে ঘুরত। বাড়িতে দুটো কাজের লোক নিয়ে দিদু থাকতেন একা। এই রাজপ্রসাদের মতো বাড়িটায় রানির মতোই বিরাজ করতেন তিনি। সিমেন্টের মেঝে দেখে আমার বুকে ধক করে লাগে। সেদিন এখানেই রঞ্জুকে শোয়ানো হয়েছিল। একটা বারমুডা আর সাদা গেঞ্জি পরে ও শুয়েছিল। গলায় ছিল বেডকভারের গভীর দাগ! কী শান্ত হয়ে ও শুয়ে ছিল।

আমি যখন কেঁদে ওর ওপর আছড়ে পড়েছিলাম, এত অল্প ভুলের জন্য এত বড় শাস্তি ও কেন দিল জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখনও ও নিশ্চুপ, শান্ত।

রঞ্জন ভয় পেত, আমি যদি ওর জীবন থেকে চলে যাই! আগলে রাখত নিজের বন্ধুদের থেকেও। তবু রামনগরের কত ছেলে যে সেইসময় প্রস্তাব পাঠাত আমাকে। প্রান্তিকদা কোনদিন কিছু বলেনি, কিন্তু আমাকে পছন্দ করত আমি বুঝতাম। তাই নিয়েও ঝগড়া করত রঞ্জন। সেই প্রান্তিকদা কলকাতা থেকে আমাকে একটা সালোয়ার কামিজ এনে দিল। আমি সেটা কেন পরেছিলাম, সেই ছিল ঝগড়ার সূচনা...।

প্রতিমাদিকে দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়াই। দিদুর দেখাশোনা করত তখন থেকে। চুলগুলো সব পেকে গেছে। আমাকে অবাক হয়ে দেখছে। প্রথমটা চিনতে পারেনি...এখন পারছে।

দিদুকে...ঠেস দিয়ে উঠে বসেছেন কারুকার্য করা খাটে...ফোকলা মুখে কী স্বর্গীয় হাসি! শাড়িটার ভাঁজ খুলে বার করে আনেন লম্বা একটা মটরদানা সোনার হার! শাড়িটার ওপর রাখেন হারটা আর দুটোই রাখেন আমার কোলের ওপর। কাঁপা হাতে ধরেন আমার ডানহাতটা। শাড়িটার ভাঁজ থেকেই বার করে আনেন একটা সোনার বোতাম। তারপর ফিসফিস করে বলেন—আমার এই নাতির নাম কী?

আমি অবাক হয়ে তাকাই। প্রশ্নটা বুঝতে পারি না। দিদু তখনও স্নেহমধুর হাসেন—কত্তার নাম কী রে?

আমি প্রস্তুত ছিলাম না এই প্রশ্নটার জন্য। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমিও ফিসফিস করে বলি—বিতান।

দিদু আমার হাতে বোতামটা গুঁজে দেন। বলেন—এটা রঞ্জনের ঠাকুরদার ছিল। তোর কত্তাকে পরতে বলিস। বলিস দিদু দিয়েছে।

যে কান্নাটাকে সামলে রাখছিলাম, 'রঞ্জন' নামটা শুনে সেটা আর পারি না। দিদুর পায়ের কাছে শুয়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকি।

সেদিনও এরকমই কেঁদেছিলাম। এই বাড়িতে।

বেশ খানিকক্ষণ পর দিদু প্রতিমাদিকে দিয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা খোলায়। সাদা শাড়ির পাহাড় সরিয়ে একদম শেষে রাখা একটা গরদের শাড়ি বার করায়। লাল পাড়। ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা শাড়িটা কাঁপা কাঁপা হাতে আমাকে দেয়।

প্রথম প্রথম দিদুকে আমার লজ্জা লাগত। কিন্তু দিদু আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, 'নাতবউ' বলে ডাকতেন—আমি দিদুর কাছে অবাধে আসা যাওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। রঞ্জু না থাকলেও আমি যখন তখন আসতাম। দিদুর বিছানায় আধশোয়া হয়ে দিদুর বিয়ের গল্প শুনতাম। সেসব গল্প শুনতে শুনতে দিদুর সুন্দর মুখ আরও লাবণ্যময় হয়ে উঠত।

দিদুকে আমি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ঠিক করে রেখেছিলাম এ বাড়িতে আসার পর দিদুকে খুব যত্ন করব। মা-হারা রঞ্জুকে উনি যেভাবে মানুষ করেছেন বুকে করে, আমিও তেমন করে ওঁকে আগলে রাখব।

গেট ঠেলে সাইকেলটা একপাশে রেখে আমি দাঁড়াই। গোটা ফুলের বাগান আগাছায় ভরা। পিছন দিকের নারকেল গাছগুলি এখন বড়। কিন্তু বড্ড ফাঁকা ফাঁকা। পল্লবিত নয় যেন।

সদর দরজা হাট করে খোলা। আগেও এমনই থাকত। আমি পায়ে পায়ে এগোই। একতলার লাল

আমি কথা বাড়াই না। আমার সব ঝাপসা হয়ে আসছে। শুধু বলি, দিদু কোথায়?

বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছেন বৃদ্ধা। তবু এই বিশাল বাড়ি, উঁচু উঁচু জানলা, চকচকে মেঝে যেন ম্লান হয়ে আছে এই বৃদ্ধার রূপের কাছে। কী উজ্জ্বল লাগছে দিদুকে! ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে দেখছেন। শীতল, কাঁপা কাঁপা হাতে স্পর্শ করছেন আমার চুল, মুখ। আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না। আমার চোখ দিয়ে অবাধে বেরিয়ে আসছে অশ্রুস্রোত। সমস্ত ঘরে হাজারো ওষুধের গন্ধ। কিন্তু আমি তীব্রভাবে পাচ্ছি দিদুর গায়ের সেই 'রানি-রানি' গন্ধ। রঞ্জন, মৃত্যুর পর কি কিছু দেখা যায়? দেখতে পাচ্ছিস এই মিলনদৃশ্য?

বেশ খানিকক্ষণ পর দিদু প্রতিমাদিকে দিয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা খোলায়। সাদা শাড়ির পাহাড় সরিয়ে একদম শেষে রাখা একটা গরদের শাড়ি বার করায়। লাল পাড়। ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা শাড়িটা কাঁপা কাঁপা হাতে আমাকে দেয়। আমি অবাক হয়ে দেখি

আজও কাঁদছি। কিন্তু কত তফাত! পনেরো বছর আগে যে ভুল বোঝা বুকে করে নিয়ে গেছি, আজ তা নিঃসৃত হচ্ছে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, কৃতজ্ঞতায়।

মৃত্যু তাহলে কিচ্ছু পারে না...কিচ্ছু না। রঞ্জন, তুই হেরে গেছিস, আর তোকে ভয় পাই না আমি। তোর থমকে যাওয়া আঠেরো বছরটাকে এখন শাসন করতে পারি আমি চৌত্রিশ বছরের এপার থেকে দিদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকি আমি...দিদুর স্নেহগভীর হাত তখনও আমার চুলে...আমিও সেই স্পর্শেই শিখে নিতে পারছিলাম চয়ন করার...শুভলগ্ন রচনা করার ক্ষমতা...আঠেরো বছর ধরে যা রঞ্জন পারেনি আমাকে নিয়ে...দশ বছর ধরে যা আমি পারিনি...বিতানের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে চঞ্চল হয়ে উঠি আমি। বিতানের কাছে, আমার ছেলে-মেয়ের কাছে যাবার জন্য। দিদুর আশীর্বাদ বুকে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি চোখ মুছে উঠে বসি। ❖

অলঙ্করণ : সমীর চন্দ

বসন্ত উৎসব

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

‘পলাশ ফুল নিয়ে আপনি যা ব্যাটল অফ পলাশী শুরু
শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের ইতিহাসে তা চিরদিন কে
—হাসতে হাসতে হালকা চালে ঋতৃণ কথাটা ছুড়ে দিল

ছয়

— আপনিও কম যান কীসে শুনি! সকালবেলা থেকে রিপোর্টিং আর সামুরাইগিরি মিলেমিশে আপনি হঠাৎ-ই কেমন জানি ডন কুইকজোটের মতন ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

— কেন? আমি তো জানতাম যুগে যুগে মেয়েরা নাইটদের পছন্দই করে এসেছে।

শুভশ্রী মনে মনে ভাবল। কে ব
করেনি! বসুন্ধরাই যেখানে বীরভোগ্য
একটা একরত্তি মেয়ে। সেও আর স
গভীরে একটা এমন পুরুষ কল্পনা ক
অথচ কোনও বাহুল্যবর্জিত। যার আবে
সঙ্গে সংযমও। তাকে হতে হবে স

শরীর-মনে রয়েছে নির্মম ঋজুতা। মুখে অবশ্য সে কিছু বলল না। স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল শুভশ্রীর মুখে।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় গোটা জীবন কাউকে খুঁজি। এমন কাউকে, যে আমাদের কল্পনায় আশৈশব তিল তিল করে গড়ে ওঠে। আমাদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই কল্পনার মানুষ বা মানুষীটিও পূর্ণতা পেতে থাকে। আমাদের পড়া কবিতায়, গদ্যে। আমাদের শোনা প্রিয় সুর-ছন্দে-সঙ্গীতে। আমাদের রোজ দেখা স্বপ্নে 'সে' তৈরি হয়। 'সে' যেন আমার জন্যই তৈরি । ঠিক এমন একটা মানুষ যাকে আমি চাই। যার স্পর্শে আমি নায়ক হয়ে উঠব। অথবা এমন কোনও এক রাজপুত্র যার জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকন্যা চোখ মেলে তাকাবে। এমন কোনও নায়ক বা নায়িকার সন্ধানে আমরা সবাই। কোথায় আমার সেই মনের মানুষ!

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরেই। বসন্তে এমন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি! জিলিপি গাছের তলায় দু'জনেই ভিজছিল। তাই দৌড়ে এসে কালোবাড়ির বারান্দায় ওরা আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ কঠোর কর্কশ গ্রীষ্মের দাবদাহে ফেটে যাওয়া চাষের খেত যেমন দুরন্ত বর্ষায় জুড়িয়ে যায় ঠিক তেমনই বোধহয় শুভশ্রী আর ঋতুণের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা ধুয়ে দিয়েছে এই হঠাৎ বসন্তের বৃষ্টি।

কালোবাড়ির বারান্দায় পাশাপাশি বসা দু'জনকে দেখে কে বলবে ভোর থেকে এদের দু'জনের মধ্যে কত তিক্ততা, কত ঠান্ডা লড়াই চলেছে! অথচ এখন এক মগ ফেনিল বিয়ারের মতন ওদের কথোপকথন চলছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত কথার ফুলঝুরি। তার গভীরে এক অদ্ভুত স্বচ্ছ গভীরতা আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেনা কমছে অথচ গভীরতা বাড়ছে।

কালোবাড়ির বারান্দায় বসেই চলছে ওদের কথা বলা। দু'জন দু'জনকে হয়তো বুঝতে চাইছে। অথবা নিছকই ভালো লাগা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ওদের এই কথোপকথন। বৃষ্টির জলে কালোবাড়িটা গোটা চত্বরের সবুজের মাঝে কেমন জানি চকচক করছে। সেই ১৯৩৪ সালে এই বাড়ির কাজ শুরু হয়। মিশমিশে কালো আলকাতরার সঙ্গে মাটির সংমিশ্রণে তৈরি কালো বাড়ি। কলাভবনের এই ছাত্রাবাসটির দেওয়ালের ভাস্কর্য,থামগুলোর স্থাপত্যরীতি তো অভিনব। এ বাড়ির গায়ে রয়েছে নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ছোঁয়া। আবার উত্তরের দেওয়ালে রয়েছেন স্বয়ং রামকিঙ্কর।

আসলে কলাভবন চত্বরের বাঁদিকে কালোবাড়ি তিলতিল করে গড়ে উঠেছে দেশ-বিদেশে কত শিল্পীর ভালোবাসায়, মমতায়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সবচেয়ে সুন্দর এই জায়গাটি। একদিকে সঙ্গীত ভবন। অন্যদিকে কলাভবন। কোথাও শিল্পীদের আঁকা প্রাচীরচিত্র, গাছপালা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর সব মিলিয়ে একটা মনোরম পরিবেশ। মানুষ আর প্রকৃতি কাঁধে

কালোবাড়ির বারান্দায় বসেই চলছে ওদের কথা বলা। দু'জন দু'জনকে হয়তো বুঝতে চাইছে। অথবা নিছকই ভালো লাগা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ওদের এই কথোপকথন। বৃষ্টির জলে কালোবাড়িটা গোটা চত্বরের সবুজের মাঝে কেমন জানি চকচক করছে।

কাঁধ মিলিয়ে গোটা পরিবেশটা সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলতেন ঠিক সে রকম—'মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন।'

এমনই সুন্দর, মনোরম জায়গায় বসে মুখোমুখি ওরা। ঋতৃণের 'লাইভ' তো ভেস্তেই গিয়েছে বৃষ্টিতে। ঋতৃণ আর শুভশ্রী এখন মগ্ন দু'জন দু'জনকে নিয়ে। ওরা থাক না ওদের মত। কালো বারান্দার কোলে।

ঠিক তখনই আরেকজন শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজের গরাদহীন কাচের জানলা দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি দেখছে। আর মাঝেমাঝে সে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা-সাহিত্যের ছাত্রী তৃণা আপাতত শুয়ে রয়েছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনর্ঘ্য সেনের বুক করা ঘরে। শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ কত কী ভেবে যাচ্ছে তৃণা। একবারের জন্যও সে ভাবেনি শান্তিনিকেতনে এসে তাকে এমন বর্ষা দেখতে হবে। অনর্ঘ্যহীন এই ফাঁকা ঘরটায় কেমন জানি একলা মনে হচ্ছে নিজেকে। তৃণার গোটা জীবন তো এই একলার সঙ্গেই থাকা। কখনও সে অভ্যস্থ হতে বাধ্য হয়েছে এই একা থাকাতে। কখনও বা সে নির্জনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে নীরবে। আবার কখনও নিঃসঙ্গতার কোলেই মাথা রেখেছে। ছোটবেলা থেকেই সে বাধ্য হয়েছে সবার মাঝে থেকেও একা হতে। এর জন্য দায়ী কে?

সল্টলেকের ডিবি ব্লকের মেয়ে তৃণাকে দেখলেই মনে হয় ছটফটে প্রাণবন্ত। এই হাসছে, এই চেঁচাচ্ছে। এই খুনসুটিতে ব্যস্ত। ঝকঝকে চেহারার অত্যন্ত স্মার্ট মেয়েটি। ঠিক যেন ওর মায়ের মতন হয়েছে। ওর মা অবশ্য আশির দশকে কলকাতা কাঁপানো সুন্দরী ছিলেন। একদা মিস ক্যালকাটা তৃণার মা হেনা চক্রবর্তীর হাতে এক সময় কত ছবিতে অভিনয়ের অফার ছিল। সে সব ঠেলে সরিয়ে বিমান সেবিকার চাকরি নিয়েছিলেন হেনা। আসলে হেনা চেয়েছিলেন উড়তে। উড়তে উড়তে তিনি এমন জায়গায় পৌঁছে গেলেন যে ছোট্ট মেয়ে তৃণার নাগালের বাইরেই চলে গেলেন। বিমান সেবিকা হিসেবে কাজ করতে করতেই বাঙালি তরুণ পাইলট বিজয় গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ। সে সময় হেনা আর বিজয় দমদম বিমান বন্দরের 'টক অফ দি এয়ারপোর্ট' ছিলেন। এয়ার হোস্টেস আর পাইলটের প্রেম তো অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু না। তবু হেনা আর বিজয়ের কোর্টশিপ থেকে সাত পাকে জড়িয়ে পড়া সব কিছু যেন ফোটো ফিনিশ ছিল। সব কিছুই চলছিল একেবারে ঠিকঠাক। গণ্ডগোল শুরু হল তৃণার জন্মের দু'বছর পর থেকে। বিজয় আর হেনার ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে লাগল। যার ফলে বছর তিনেক ঘুরতে না ঘুরতে দু'জনের বিবাহ বিচ্ছেদ। বারো বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের সঙ্গেই ছিল তৃণা। তারপর হেনার দ্বিতীয় বিয়ের পর বিজয় এক প্রকার জেদ করেই মেয়েকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। তৃণা আসলে বিজয়ের মা আর দিদির কাছেই মানুষ। আর বিজয়, তার জীবনটাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন জলদি পাল্টে যেতে থাকে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে

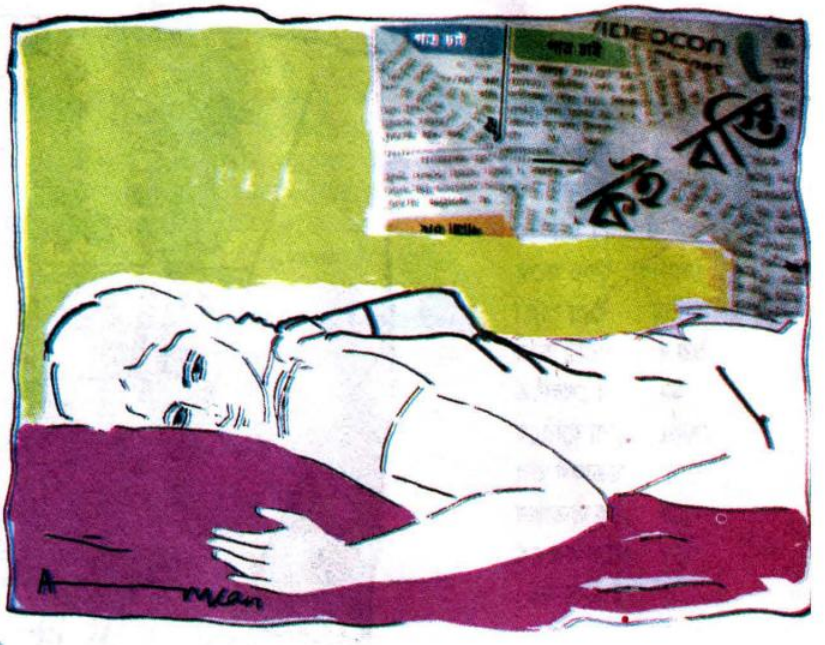

উড়োজাহাজে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছে। আর অবসরে ক্লাব, বন্ধু আর দামি স্কচের সান্নিধ্য। ছোটবেলা থেকে তৃণাকে যেন একটা নিঃসঙ্গতা ঘিরে রেখেছে। নিঃসঙ্গতাকে এড়াবার কম চেষ্টা কি সে করে! এত বন্ধু-বান্ধব, অল্প বয়সে সিগারেট ধরা, হাইস্কুল থেকেই একটার পর একটা সম্পর্ক—সবই তো সে করেছে। ওই সদা চঞ্চলা তৃণার ভিতরে কুঁকড়ে থাকা তৃণাকে সে তো ভুলিয়ে রাখার কম চেষ্টা করেনি। ওর অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখের কোণে একটা বিষণ্ণতা লুকিয়ে। তাই কি ওর চোখটা এত সুন্দর!

সহপাঠীদের অনেককেই তো কম ঘোল খাওয়ায়নি তৃণা। মেলামেশা-ঘনিষ্ঠতার কিছুদিন পরই ওর মনে হতে থাকে সব কিছু যেন কেমন একটা পানসে পানসে। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। হয়ত সমবয়সি ছেলেদের থেকে তৃণা পরিণতমনস্ক। সারাটা জীবন তৃণা নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগাকেই সব চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। ক্লাস টু-তে বিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্রী হয়েও হঠাৎ-ই তার সাহিত্যপ্রেম এত গাঢ় হয়ে উঠল যে যাদবপুরে কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে পড়তে শুরু করল। আর সেখানেই ক্লাসরুমে অনর্ঘ্যর সঙ্গে প্রথম দেখা। বোদলেয়ার, রিলকে, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ সব কিছুতেই অনর্ঘ্য স্বচ্ছল-সাবলীল। অনর্ঘ্যর পড়ানোর ধরন সবার থেকে অন্যরকম। অনর্ঘ্য যখন পড়াত অবাক হয়ে শুনত তৃণা। অনর্ঘ্যর পড়ানো শুনতে শুনতে কেমন যেন হারিয়ে যেত সে। অনর্ঘ্যর পড়ানো অনেকটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতন। ধীরে ধীরে চেতনার প্যারাফেনিতে ঢুকে যায়, সৌম্য-সুদর্শন-প্রাণবন্ত মানুষটিকে দেখলে কে বলবে সাহিত্যের অধ্যাপক!

অনর্ঘ্য তৃণার আর
বার থেকে
একেবা অন্যরকম
ত ।। ওর ঘন
লোমশ কের মধ্যে
হারিে ওয়া যায়।
ওর স. শরীর আর
মন য় খেলতে
খেলে ৃণা হারিয়ে
যা. যতক্ষণ ওর
সঙ্গে কে ততক্ষণ
তৃণ মনে হয় সে
র একা নয়।

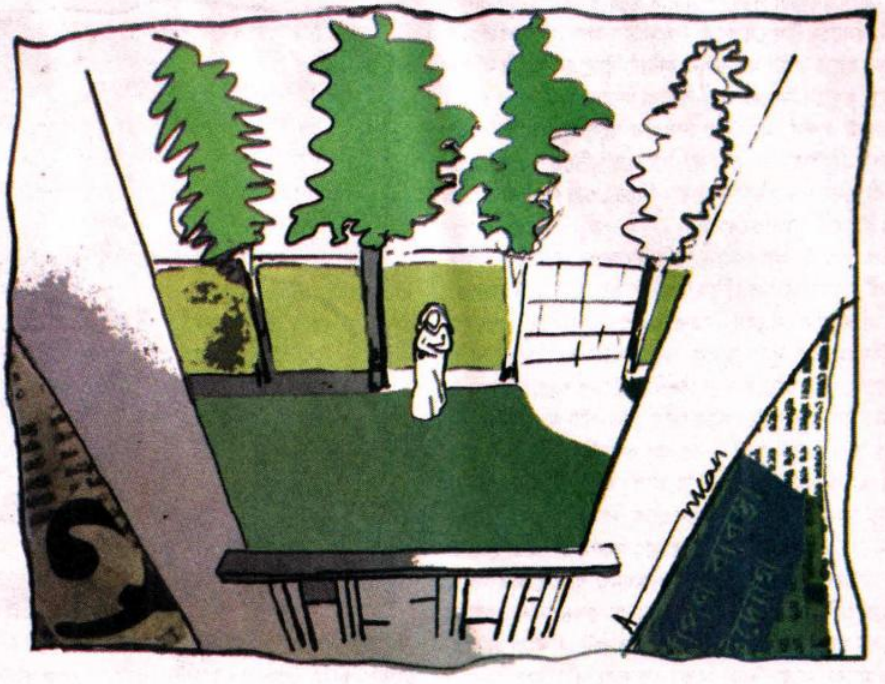

বরং বাবার সঙ্গে কোথায় যেন তার মিল খুঁজে পায় তৃণা। এটা হয়তো আমাদের সবারই হয়। প্রেমিকার মধ্যে মা আর ভালোবাসার পুরুষের মধ্যে বাবাকে খুঁজি।

অনর্ঘ্যকে তৃণার আর সবার থেকে একেবারে অন্যরকম লাগে। ওর ঘন লোমশ বুকের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায়। ওর সঙ্গে শরীর আর মন নিয়ে খেলতে খেলতে তৃণা হারিয়ে যায়। যতক্ষণ ওর সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তৃণার মনে হয় সে আর একা নয়। নোট্স, পড়া, সিলেবাসের ছাত্রী-অধ্যাপক সম্পর্ক কখন যে সিলেবাসের বাইরে চলে গিয়েছে... এখন তৃণার জীবন জুড়ে অনর্ঘ্য। প্রতিটা মুহূর্ত অনর্ঘ্যর সঙ্গে সে কাটাতে চায়। এই যে বসন্তের বৃষ্টিতে একা শুয়ে রয়েছে অনর্ঘ্যেরই বুক করা ঘরে। কিন্তু সত্যি কি এমন হওয়ার কথা ছিল! আজ তো ওর সঙ্গে থাকার কথা অনর্ঘ্যরও। কিন্তু সব যে কী হল। অনর্ঘ্য এখন তার স্ত্রীর সঙ্গে আসছে। সারাটা জীবন কি তৃণার সঙ্গে এমনই হবে! হঠাৎ-ই তৃণার বুকের ভিতরে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল তৃণা। বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ-ই যেন তৃণার অসহ্য লাগল। বড্ড একা মনে হল। ভীষণ ভীষণ কান্না পেতে লাগল। এক ফাঁকে তৃণা নেমে পড়ল শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজের লনে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আকাশের দিকে মুখ তুলল তৃণা। উপরওয়ালা কি লক্ষ করছেন বৃষ্টির জলের সঙ্গে কখন মিশে গিয়েছে তৃণার চোখের জল। বসন্তে হঠাৎ বৃষ্টি, হোক না, ধুয়ে যাক হৃদয়ের সব মালিন্য।

মোহনা আর সুস্মিতা ব্যস্ত খিচুড়ি রান্না করতে। এমন বৃষ্টিতে খিচুড়ি না হলে চলে! মোহনা যে রান্নায় খুব আগ্রহী তা নয়। তবে আজ সে যেন রান্নার ব্যাপারে একটু বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ছোট্ট সুস্নাত ব্যস্ত গাড়িবারান্দায় মাটি নিয়ে খেলতে। অগ্নি ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বাংলা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে বেড সাইড টেবিলের উপরে রাখা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে। মোহনার স্বামী অবনী ব্যস্ত তাদের ঘরে দাড়ি কাটতে।

রান্নাঘরে সবাই খুব ব্যস্ত। জোর কদমে কাজ চলছে। সুস্মিতা আলু ভাজছে। রাঁধুনি মাছ ভাজতে ব্যস্ত। মোহনা সব কিছু তদারকি করছে। গরম গরম রুই মাছ ভেজে সদ্য তুলে রাখা হয়েছে। হঠাৎই মোহনার মনে হল অগ্নি বেচারা শুধু শুধু বিয়ার খাচ্ছে, কয়েকটা মাছভাজা তাকে দিয়ে আসা দরকার। দেখে দেখে গাদার ভালো করে ভাজা মাছের পিস সে তুলে আলাদা করে রাখল। এখন মুশকিল সবার মাঝে মোহনা কী করে মাছভাজা নিয়ে অগ্নির ঘরে যাবে। একবার ভাবল সুস্মিতাকে দিয়ে অগ্নির ঘরে মাছ ভাজা পাঠাবে। জানলার বাইরে তাকাল মোহনা। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বসন্তের বেপরোয়া বৃষ্টি। প্রকৃতি বোধহয় কখনও কখনও মানুষকে আচ্ছন্ন করে। কখনও কখনও উসকে দেয়। বসন্তে যদি বৃষ্টি অনুপ্রবেশ করতে পারে তবে মোহনা কেন তার অগ্নির কাছে মাছ নিয়ে যেতে পারবে না।

এদিকে অভিষিক্তা শান্তিনিকেতন গেস্টহাউসে পৌঁছে বেশ গুছিয়ে বসেছে। স্নান করে ফ্রেশ হয়ে গীতাঞ্জলি নিয়ে বসে পড়েছে। সেই কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে। বিশেষ এগোতে পারেনি। অভিষিক্তার ইচ্ছে ছিল গাড়িতে আসতে আসতে বইটা শেষ করে ফেলবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ এমনই। পাঠক ইচ্ছে করলেই কি তার লেখা পড়া যায়! ওঁর লেখা পড়ার জন্য চাই সাধনা। আসলে অভিষিক্তা ছোটবেলা থেকে কতবার ভেবেছে গীতাঞ্জলি পুরোটা পড়বে। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। এবার সে এক প্রকার প্রতিজ্ঞাই করে ফেলেছে, 'গীতাঞ্জলি' সে শেষ করবেই। রবীন্দ্রনাথে সবে ডুব দিয়েছে অভিষিক্তা। ঠিক সেই সময় হঠাৎ বেজে উঠল তার মোবাইল ফোন। কিছুটা বিরক্ত হয়েই অভিষিক্তা ফোনটা তুলে নিল। স্ক্রিনে একটা নাম ভেসে উঠল। তা দেখে অভিষিক্তার কপালে ভাঁজ পড়ল। এমন সময় তো এই ফোনটা আসার কথা ছিল না। খাটের উপরে ছড়ানো রয়েছে নীলের দেওয়া পলাশ ফুল। গীতাঞ্জলির মধ্যে বুক মার্ক হিসেবে একটা গোটা পলাশ ফুল রেখে দিল। ফোনটা থেমে আবার বেজে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছে অভিসিক্তা ফোনটা ধরতে আগ্রহী নয়। তবু ফোনটা যেন নাছোড়বান্দা। যতক্ষণ না সে ধরবে বেজেই যাবে। কিছুটা বাধ্য হয়েই ফোনটা তুলল অভিষিক্তা। ফোনের অপর প্রান্তে কাউকে কিছু কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেশ রাগত সুরে অভিষিক্তা বলল, 'আপনাকে বলেছি না এখন সাতদিন আমাকে ফোন করবেন না। প্লিজ, এ কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।'

কোনও কথা না শুনে ফোনটা কেটে ছুড়ে দিল বিছানার একদিকে। জানলার দিকে তাকাল অভিষিক্তা। আকাশ আগের থেকে কিছুটা ফরসা হয়েছে। বৃষ্টির জোরও কিছুটা কমেছে। অভিষিক্তা আবার বইটা হাতে তুলে নিল। সযত্নে বুকমার্ক হিসেবে রাখা পলাশ ফুলটা তুলে নিল। পলাশের রংটা দেখে অভিষিক্তার মনে হল কী অদ্ভুত সুন্দর! অভিমানে লজ্জায় রাঙা যেন ফুলটা। ফুলটাকে তুলে গালে ঘষতে ঘষতে একটা অদ্ভুত শিহরন খেলে গেল তার শরীরে। কী নরম-লাজুক ফুলটা!

অভিষিক্তার চোখে ভেসে উঠল নীলের মুখটা। ওর দৌলতেই তো পাওয়া গেল পলাশ। ছেলেটার বড় বড় কোঁকড়ানো চুল, অযত্নে বেড়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বড় বড় চোখ দুটো। দেখলেই বোঝা যায় শিল্পী। হঠাৎই নীলের নম্বরে ফোন করে বসল অভিষিক্তা।

—হ্যালো। অভিষিক্তা বলছি। কে, নীল?

—হ্যাঁ। বলুন। গেস্ট হাউসটা ঠিকঠাক পেয়েছেন তো?

—কোনও অসুবিধে হয়নি। আপনি যা সুন্দর ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বিকেলে কী করছেন?

—তেমন কিছু না।

—তাহলে আমার এখানে চলে আসুন না। বিকেলে একটু বেরোই।

—হ্যাঁ। আমার অসুবিধা নেই। যদি না বৃষ্টিটা...

—বৃষ্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে।

—তাহলে তো আর কোনও অসুবিধেই নেই।

—আমি বোধহয় একটু তাড়াহুড়োই করছি। আপনিই তো বলেছেন বসন্ত উৎসবে যা ভিড় তাতে শান্তিনিকেতন আর শান্তিনিকেতন থাকে না— অশান্তিনিকেতন হয়ে ওঠে? বলে হেসে উঠল অভিষিক্তা। ঠিক হল নীল বিকেলে আসবে। রিসেপশনে এসে নীল বললেই অভিষিক্তা বেরিয়ে আসবে।

এতক্ষণে অনর্ঘ্য আর দেবযানী ওদের হোটেলে পৌঁছে গিয়েছে। হোটেলের ঘর দেবযানীর বেশ পছন্দই হয়েছে। ঘরদোরের ব্যাপারে দেবযানী আবার একটু বেশিমাত্রায় খুঁতখুঁতে। সে ঘরে ঢুকে বাথরুমটা দেখতে ব্যস্ত। সিগারেট খাওয়ার নাম করে অনর্ঘ্য ফোন নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। অনেকক্ষণ তৃণার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। তৃণাকে ফোন করল। একবার, দু'বার...তিনবার। অনর্ঘ্যর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। কী যে হল মেয়েটার! ফোন ধরছে না কেন? এমন তো কখনও হয় না।

তৃণা ফোন ধরবে কী করে? সে তো এখন তো ট্যুরিস্ট লজের লনে। বৃষ্টি কমেছে বটে, তবু পড়ছে। আর তৃণা একমনে লনে বসে ভিজছে। এখানে ওর কেউ তো নেই যে বলবে অসময়ের বৃষ্টিতে এতক্ষণ ভেজা উচিত নয়।

মোহনা মাছভাজাগুলো নিয়ে সুস্মিতাকে বলল, 'এগুলো কর্তাদের দিয়ে আসি।' হাসিমুখে আলু ভাজতে ভাজতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে।

মোহনা তাড়াহুড়ো করে অগ্নির ঘরে ঢুকল।

—নাও মাছগুলো খেয়ে আমাদের উদ্ধার করো। খালি পেটে বিয়ার ভালো নয়।

বেডসাইড টেবিলে বিয়ারের গ্লাস সরিয়ে মাছ ভাজার থালাটা রাখছে মোহনা। ও নিচু হতে মোহনার স্পষ্ট স্তন বিভাজিকায় চোখ পড়ল অগ্নির। মোহনার শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজা। রান্না ঘরে যা গরম। বিন্দু বিন্দু ঘাম ওর মুখে।

অগ্নি উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরল মোহনাকে। মোহনা ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী করছ!'

মোহনাকে আরও কাছে টেনে নিল অগ্নি। বিয়ারের আবেগে মাথাটা তার কেমন ঝিমঝিম করছে। অগ্নির এক টানে মোহনা তখন তার কোলে বসে পড়েছে। অগ্নির মুখ কখন যে ঢেকে গেল মোহনার বুকে। ঘাম, রান্নাঘরের গন্ধ, মোহনা, বিয়ারের আবেগে অগ্নি তলিয়ে যাচ্ছে। মোহনা নিচু স্বরে বলছে, 'ছাড়ো। ছাড়ো! কেউ এসে পড়লে?'

মোহনার বুক থেকে মুখ তুলল অগ্নি। বড় সুন্দর মোহনার ঠোঁট দুটো— ঈষৎ ভেজা, উষ্ণ, নরম মোলায়েম। অগ্নি মোহনার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

ঠিক তখনই গায়ে মাটি মেখে ছোট্ট সুস্নাত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলল— 'বাবা আমি একটা বাড়ি বানিয়েছি।' ❖

চলবে

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি কবিতা

শ্বেতা চক্রবর্তী

রঙিন

কুড়ি বছরের বড়, তবু কোলে বসে কত যে আনন্দ
গভীর নিবিড়তমা প্রেম— একে কতদূর যেতে দেওয়া যায়?
কোন্য ফেরিঘাটে? অন্ধ মানুষটি ধীরে ধীরে স্পর্শ করবে
বুক, পিঠ, জীবন্ত চিবুক আর থরথর কম্পমান
যেন বা অর্জুন— গাণ্ডীব ছোঁড়ার পরে, নিভৃত বিলাপে বর্ষাতুর!
বসেছিল বহুক্ষণ সে;
কুড়ি বছরের আগে পৃথিবীতে এসে
উৎকৃষ্ট মাদুরখানি কোলে পেতে রেখে কতকাল
ছিঁড়বার ঠিক আগে দেখেছে যে তার ওপরে
বসেছে কিশোর প্রেম— সন্ধের রোদের মত লাল!

কন্যা

একবারই মেনে নিয়েছিল — দ্বিতীয় পিতাকে;
বারবার কিছুতেই তুমি মানতে পারনি কোলাহল,
বিরক্ত হয়েছ, মৃত্যুর পথে চলে যাবে— ধমক দিয়েছ,
গুটিয়ে গিয়েছে তোর মা— প্রেমিকার বেশবাস ছেড়ে
অনেক রাত্রিতে তোর কপালের তাপ শুষে নিয়ে
ঈশ্বরকে বলেছে— বাঁচতে দাও!
অন্যরকম করে, ভিন্ন কোলাহলে বাঁচতে দাও আমাকে এবার,
গভীর নিবিড় করে বাঁচতে দাও!
বিষকুয়োটির পাশে হাত নেড়ে বলেছেন গ্রাম্য বৃদ্ধা
— না! না! না!
স্নেহের স্পর্শ পেয়ে তার হাতের লতা খেয়ে তৃষ্ণা নিয়ে
ফিরে গেছে অমল হরিণী!

পোষা

নিজেরই তো পোষা পাখি! ঠোঁটফাঁক করে তার
সুখাদ্য চুকিয়ে অপেক্ষা করেছি গ্রহণের,
পুরোনো দানার কথা মনে প'ড়ে তার অশ্রু ছলছল
চোখের লাবণ্য দেখে বুঝেছি কপালজোড়া টিপ
এবার ফেলতে হবে, এবার বোঝাতে হবে তাকে
বিভ্রমের পরেও বিভ্রম বাকি থেকে যায়,
মানুষমাত্র এ ছবি মানায়; সুখাকারে, দুঃখাকারে
বারবার ফিরে আসতে হয় একাকী আসনে,
নতুন স্বপ্নের মধ্যে, নতুন ওড়ার আকাশে .....

স্মৃতি থেকে যায়

মীর আজিজুর রহমান

স্মৃতি থেকে যায়। খুব দ্রুত নেমেছিল শীত,
আমার অষ্টাঙ্গে। অশ্লেষা ছায়া।
আমি ছিলাম না কোনও অক্ষবেত্তা। অক্ষীয় বৃত্তে
শুধু স্থূল সরীসৃপ। সে দিন ছিল না বর্ষা
কুয়াশা সরিয়ে বৃষ্টি; আছড়ে পড়ে রতি ক্রীড়া।
মাকড়শার জালে আবৃত্ত, সেই নির্লিপ্ত সময়।
স্মৃতি থেকে যায়। অতি পুরোনো উইপোকায়
কাটা জীবন প্রচ্ছদ। সতেজ গোলাপের জীবাশ্ম।

শহরনির্মাণ

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাব, ঋদ্ধিমতী শহরে
প্রবল ঝড়ে উড়িয়ে দেব তোমাকে লেখা হোর্ডিং
অশান্ত উড়ালপুলের ওপর দাঁড়িয়ে
পরিচিত হর্ষডাকে তোমাকেই ডাকছি—
পাখিমগ্ন বিকেল

ঘোড়াগুলো অলৌকিক উড়ে যায় ভিক্টোরিয়ার
তাঁথে উপবন ছেড়ে
আমি বদ্ধ চার্নকের মতো সাজাতে থাকি
সম্রাজ্ঞী কলকাতার প্রথম মুখ

সাইকেল

অতনু ভট্টাচার্য

সঙ্গী সাইকেল। বহু পথ আমরা পার হয়েছি। যতদূর গেলে নির্জন হওয়া যায়।
দুপুর আর সন্ধ্যাগুল...। সাইকেল..., এখন যার মানে-বদল ঘটে গেছে...।
সাইকেল চুরি গিয়েছিলো– বাড়িতে মায়ের ঘ্যান ঘ্যান, বাবার ধমক ছুঁতেও পারেনি
আমার স্তব্ধতা...। মতিগতি দেখে- সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল কিনে বাবা বলল;
লে...। তরল আমার জমে থাকা কান্নারা...। সাইকেল ছিল
আমার সঙ্গী
নির্জনতা খোঁজার...। সময়ের কৌতুকে সিঁড়ি ঘরের
নিচে
প্রায় অব্যবহৃত, একলা পড়ে আছে।

নভেলেট

চিহ্ন

স্বাতী গুহ

দূর থেকে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা সোহমকে দেখে তুলু বুঝতে পারে সিগারেটে মগ্ন সে। যেন এই পৃথিবীতে তেমন কিছুই ঘটেনি যে তাকে চিন্তিত হতে হবে!

যেন তুলুকে অবশেষে সে বোঝাতে পেরেছে তার বাধ্যতার কথা। স্ত্রী হিসেবে না হোক মানুষ হিসেবে আপাতত তুলুর কাছ থেকে যাবতীয় আনুগত্য আদায় করে নিতে পারবে সে—জেনে গেছে তাও। মাথার ভিতর ঝিনঝিন করে ওঠে তুলুর। সেই রাতের ল্যাপটপে মনিটর জুড়ে যে জীবনের টুকরো ছবি দেখেছিল সে, তাকে সবার সামনে এনে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু কী হবে তাতে? বিয়েটা ভেঙে যাবে। তারপর আবার একটা বিয়ের চেষ্টা, আবার অন্য এক পুরুষের অন্য কিছু অভ্যাসের টের পাওয়া। নাকি এবারের মতো সোহমের কথা মেনে নেবে! কিন্তু গ্যারি যে সোহমকে ছেড়ে দেবে তার কি গ্যারান্টি আছে? আর সোহম যে সত্যি চেষ্টা করছে ওই সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসার, তার তো কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না সে আজ

সতেরো-আঠেরো দিন ধরে। রোজ গভীর রাতে গ্যারির সঙ্গে ভিডিও চ্যাটে বসে ও। স্কাইপ-এর জানালাটা ওভাবে সেদিন খোলা না থাকলে তো তুলুর বুঝতে আরও কিছুটা বেশি সময় লাগত।

সোহম রোজ নিয়ম করে নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকেছে রাত বেড়ে গেলে। কিন্তু ব্যালকানির কানেকশন দিয়ে চলে গেছে পাশের ঘরে। যে ঘরে নাকি অনেক বছর হল ঋতম ঘুমোয়। ফুলশয্যার সাজানো বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বোকা বোকা যে যুক্তি সাজিয়েছিল সে সেদিন, তা অসহ্য লেগেছিল তুলুর। মাথাব্যথা বলে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল ও। চারদিন ঠিক একভাবে কেটে যাওয়ার পর তুলু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার অন্য কোনও প্রেমিকা আছে?'

'না তো!' এমন বিস্ময় ঝরে পড়েছিল সোহমের গলায় যেন সামান্য একটা আধুলি লুকিয়ে রেখেছে বলে তুলু ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইছে।

'তবে তুমি নরম্যাল বিহেভিয়ার করছ না কেন?' তুলুর প্রশ্নের তিরকে সামান্যও অগ্রাহ্য না করে সোজাসুজি ওর চোখে চোখ রেখে সোহম বলেছিল, 'উই উইল ডিসকাস ইট সাম আদার টাইম।'

— কেন এখন নয়?

— তুলু, আই নিড আ লিটল টাইম। প্লিজ বিয়ার উইথ মি।

সোহমের গলায় এমন একটা আকুতি ছিল যে তুলুর মনে হয়েছিল এখুনি এই সব কথাগুলোকে কেটে ছিঁড়ে হাতড়ে দেখতে চাইলে যেন তুলুকে খুব আদেখিলা মনে হবে। মনে হবে শরীরের উপোসি ভার তার বড় বেশি। অলজ্জ সেই ভাবকে যে সে কিছুতেই সামনে এনে ফেলতে পারে না এত কম পরিচিত পুরুষটির কাছে। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ওদের। কথাবার্তা যা হয়েছে তা ই-মেলে আর সোস্যাল নেটওয়ার্কে। সামান্য দেখা আর একদিন কয়েকঘণ্টা বাইরে ঘুরে এলেই কি কোনও পুরুষের কাছে বলে ফেলা যায়— শরীরের চাহিদার কথা? আসলে শরীর নয়, তুলুকে ভাবাচ্ছিল বিবাহিত স্বামীর কাছে না আসতে পারার নিরাপত্তাহীনতা! নিজের এই সব ভাবে মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়েছিল বুঝি সে কিছুটা। নিজের এই সলজ্জ ভাবমূর্তিটাকে নষ্ট করতেই সেই রাতে তুলু সাহসে ভর করে ব্যালকানির অন্ধকার পার হয়ে এসে ঢুকেছিল ঋতমের ঘরে। পর্দা সরাতেই চোখে এসে ঠিকরে লেগেছিল মনিটরের আলো। অন্ধকারে ঘুমন্ত ঋতমের ঋজু শরীরটার দিকে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠেছিল সে সেদিন। কারণ সোহম তখন গভীর কী এক আলাপে মত্ত। সামান্য সময় লেগেছিল তুলুর সেদিন সেই ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে। নাকি এক আশ্চর্য হাতছানি ছিল ওই মনিটরের খোলা পাতার। রাতের কুহকের মতো কিংবা তন্ত্র বা গ্যাটো পাবের অন্ধকারময় আলোর মতো টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওকে একেবারে সোহমের কাছাকাছি। স্ক্রিন জুড়ে দীর্ঘকায় এক পুরুষের উপস্থিতি। দূর থেকে দেখলে হঠাৎ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ছবি কিংবা রদ্যাঁর ভাস্কর্যের প্রিন্ট ভার্সানও মনে হতে পারে। কিন্তু চোখটাকে সামান্য থিতু করতেই টের পাওয়া যায় তার নড়েচড়ে বসার বিভঙ্গ। বাস্কেটবল প্লেয়ারদের মতো লম্বা শরীরের পুরুষটির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মিউজিকের হাই নোটের চিহ্নের মতো। অসম্ভব কালো রঙের শরীরে প্রথমেই নজরে আসে চোখ দুটো। অসম্ভব উজ্জ্বল আর ধারালো। জ-লাইনে সামান্য নমনীয়তা, কিন্তু মুঠো করে রাখা হাতদুটো যেন অন্য কোনও অস্থিরতাকে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা। একটা ল্যাভিস সোফায় আধশোয়া এই পুরুষটির শরীরে এক টুকরোও লজ্জাবস্ত্র নেই, তা খেয়াল করেছে তুলু কয়েক সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পর। সোহমের সঙ্গেও তার দূরত্ব কখন যে কমে এসেছিল পায়ে পায়ে সে হিসেব রাখেনি রাতের ঘুমন্ত তারারা। সোহমের মাথার ওপর থেকে হেডফোনের অ্যাটাচমেন্ট। কানের পাশ থেকে সরু স্লিক মাউথপিস মুখের কাছাকাছি এসে থেমেছে। বোঝা যায় এই মানুষ দুটি হাজার হাজার কিলোমিটারের দূরত্বকে অস্বীকার করছিল ইন্টারনেটে জড়িয়ে পড়ে। মনিটরের আলো সোহমের মুখে এসে পড়েছে। তেরছা ভাবে পড়তে চাইছিল যেন তুলু সোহমের চোখের ভাষা। কিন্তু পোশাকবিহীন সোহমকে এই প্রথম মাঝরাতে এভাবে স্কাইপের নৌকোয় চেপে বহুদূর দেশে চালান হয়ে যেতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিল সে! ওয়েব ক্যামেরায় নিজেকে বন্দি করে কার কাছে পাঠাচ্ছিল সে? ওই কৃষ্ণকায় পুরুষটিই বা কে? সমস্ত প্রশ্নগুলো একসঙ্গে গলার কাছে পাকিয়ে উঠেছিল তার। এমন জোরে 'ওয়াক' শব্দ বেরিয়ে এসেছিল সেই রাতে তুলুর পাঁজর নিংড়ে যে ঋতমের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সহসা। কত পরে মনে নেই, চোখ মেলে দেখেছিল সে শুয়ে আছে তার নিজের বরাদ্দ ঘরের খাটে। আর পাশে বসে সোহম একটা বই পড়ে চলেছে মন দিয়ে। ধড়ফড় করে উঠে বসতে গেলে সোহম তাকে শুয়ে থাকতে অনুরোধ করেছে। দ্বিধাহীন স্বরে বলেছে, 'কাল সকালে আমরা কথা বলব। এখন ঘুমোও।'

কিন্তু ঘুম আসেনি সে রাতে তার। ভূতের ভয়ের চেয়ে খুব বড় এক ভয় পেঁচিয়ে ধরেছে তাকে পাকে পাকে। খুব ইচ্ছে করেছে দাদার মতো সোহমের গা ঘেঁষে শুয়ে থাকে সেই রাতে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যা যা সে দেখেছে তা যেন পরতে পরতে ঘরের ছাদ থেকে নেমে আসতে থাকে তার বালিশে বিছানায়। সোহমকে সহ্য হয় না তার। মনে হয় কেন সে ঠকাল তাকে? কেন, কেন? কোনও প্রশ্নও আর বেরোয় না তার শুকনো হয়ে আসা জিভ আর ঠোঁটের খসখসে অমসৃণ পথ চিরে। হঠাৎ এক মুখ তেতো জলে ভরে ওঠে ওর মুখের গহ্বর। দৌড়ে টয়লেটে যেতে যেতে বুঝতে পারে কোনও শক্তি আর নেই যেন ওর। যেন একটা ঘটনা, না একটা দৃশ্য শুধু— ওর সমস্ত সজলতা নিংড়ে নিয়েছে এই রাতে। বেসিনের কল খুলে চোখে-মুখে আরও কিছুটা জল ছেটাতে থাকে সে সেই সতেজতা ফিরে পেতে। খলবল জল চোখে সামনের আয়নায় তাকাতেই চিৎকার করে উঠেছিল সে। আয়নায় এমন ভূত সে তো জীবনে কখনও দেখেনি তাই রাত্রির অন্ধকারের রং কেমন যেন ফিকে লেগেছিল সেই কৃষ্ণকায় পুরুষের শরীরের থেকে। সাদা-কালো এরার ছবির মতো যেন। সোহমের হুইটিস্ শরীরটাকে অনেকটা দামি টয়ের মতো নিজের শরীরে সেঁটে রেখেছে গ্যারি। পরের ফ্রেমেই পেজ-থ্রি-র সেই দৃশ্য! কঙ্কণা সেনশর্মা প্রেমিক মডেল ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে এসে ঠিক যে ভঙ্গিতে দেখেছিল বন্ধু মেকআপ আর্টিস্ট ছেলেটিকে, হুবহু সেই দৃশ্য! শুধু সোহমের আনত শরীরে সেই মেক-আপ আর্টিস্টের বাঁক। দীর্ঘকায় গ্যারির চোখে অদ্ভুত এক আলো! না, আর সহ্য করতে পারছিল না ও সেই সব দৃশ্যমালা। দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিল টয়লেটের মেঝেতেই। ততক্ষণে সোহম ডেকে এনেছে ঋতমকেও। ঋতমই ওর হাত ধরে তুলে এনেছে বিছানা পর্যন্ত। কোনও কথা বলেনি আর সেই রাতে ওরা। কোনও কথা শুনতে চায়নি আর তুলু সে সময়।

গাড়ি থেকে নেমে গ্রিলের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই কোথা থেকে যেন আকাশবাণীর মতো শুনতে পায়—

তুলু, সোজা আমার ঘরে যা। আমি দু'মিনিটে আসছি।

পরমার আওয়াজে এমন গার্জিয়ানের ভঙ্গি শুনে এসেছে ও এতগুলো বছর। কিন্তু আজ যেন সেই স্বরে কোথাও এক মাত্রায় এসে জুড়েছে একটা আশঙ্কা আর বিষণ্ণতার বলয়। সিঁড়ির কাঠের রেলিংয়ে হাত রেখে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগোনো তুলুর ছোটবেলার স্বভাব। যেন পৌঁছোনো নিয়ে তেমন কোনও তাড়া নেই। মাঝখানের ল্যান্ডিং-এ পৌঁছোতেই বউদিকে দেখতে পায় ও। হাতের ট্রে-তে সাজানো দু'কাপ চা। জামাই আদরের কোনও খামতি নেই। আবার এখন সোহমের সামনে বসে অহেতুক কিছু কথা শুনতে হবে, বা হবে না—ভাবতে ভাবতেই ওর কেমন ক্লান্ত লাগে। ঘুম ঘুম পায়।

— আমি জানি তোর স্লিপি লাগছে। পরমার

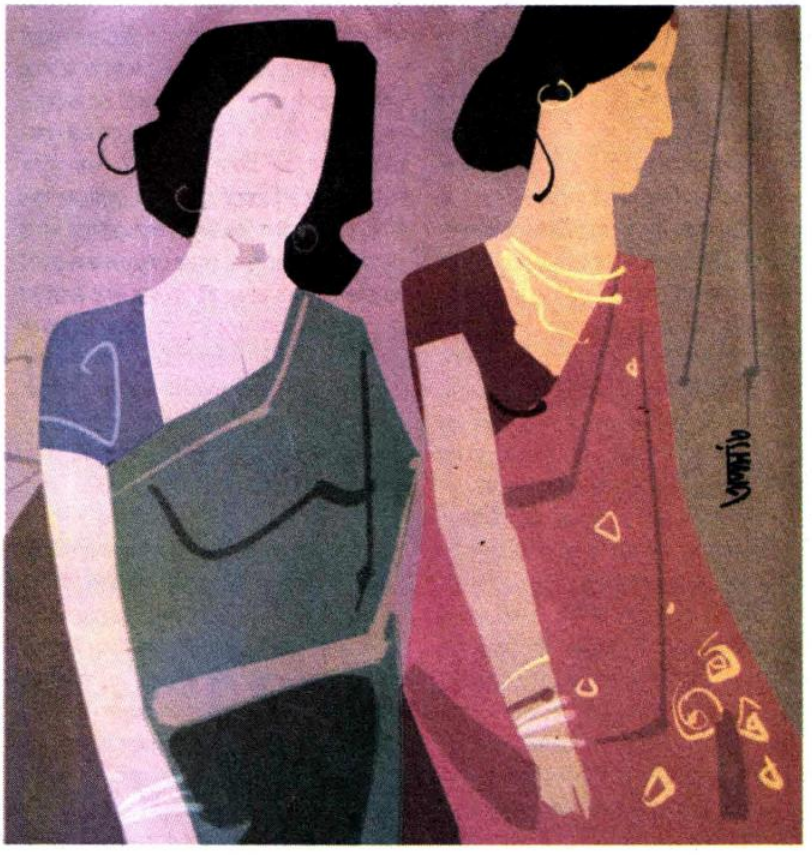

তুলু অগোছালো চুলগুলোকে কিছুটা বাধ্য করে তুলতে চায়। পরমা ওর খোলা চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিলে হঠাৎ সে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে জাপটে ধরে বউদিকে। পরমা টের পায় একটা থামিয়ে রাখা তুফানের। ব্যথা পায় তুলুর শরীরের চাপ সহ্য করতে করতে।

আওয়াজে তুলু বোঝে এক কাপ চা তারও বরাদ্দ।

—তুমি জানো না এমন কি কিছু আছে বউদি?

—অনেক কিছু। আর সেগুলো জানতেই এখন তুই আর আমি একটু একা একা আড্ডা দেব। তোর দাদাকে ভিড়িয়ে দিয়েছি সোহমকে কম্পানি দেওয়ার কাজে।

— ঠিকই করেছ।

— মানে?

— মানে হি উইল এনজয় দাদাস কম্পানি।

— এমন বলিস না। ওর আমাকেও বেশ পছন্দ!

— তোমাকে পছন্দ নয় এমন মানুষ আমাদের সেজো পিসি ছাড়া আর কেউ আছে বলে তো শুনিনি।

— মাস্কা?

— ধুর! আমি খুব টায়ারড জানো।

— বিয়ের পর পর এমন টায়ারড সবাই থাকে। নাথিং নিউ।

— এভরিথিং ইজ নিউ ইন মাই কেস।

— কেন, হঠাৎ এমন বলছিস?

— নিউ... তাই বলছি।

— চল, একটু আরাম করে বসি। তোর কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এবার স্পষ্ট করে বল তো, সমস্যাটা কোথায়?

— পুরোটাই সমস্যা। কোথা থেকে শুরু আর কোথায় শেষ আমি জানি না।

— সোজাসুজি বল।

— সম্ভব না।

— কেন?

— কারণ ব্যাপারটা তেমন স্ট্রেইট নয়, তাই।

— সোহমের কোনও ফিজিক্যাল প্রবলেম?

— সর্ট অফ!

— কী সমস্যা? সাইজ অর ইরেকশান?

— ধুৎ! সে সব নয়।

— মানে? বিয়ের পর এটা তোদের থার্ড উইক চলছে। আর তুই কিছুই জানিস না! কিছুই দেখিসনি!

— কী জানার কথা বলছ?

— ওর কোনও সমস্যা আছে কি না।

— মানে জানতে চাইছ ওর ওই সবগুলো ঠিকঠাক আছে কি না?

— হ্যাঁ।

— সে সব বিন্দাস!

— তুই যদি সে সব জানিস, তার মানে ইউ হ্যাভ অ্যান এনকাউন্টার।

— নট অ্যাট অল!

— কী যে বলিস, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

— তা একটু যাওয়া ভালো।

— ফাজলামি করিস না। তুই জানিস যে সোহম ফিজিক্যালি আনফিট নয়। তুই দেখেছিস ওকে?

— হ্যাঁ।

— তাহলে?

— তাহলে কী?

—ও তোর কাছে না এলে, তুই দেখলি কী করে?

— আমি গিয়েছিলাম ওর কাছে।

— আই কান্ট বিলিভ!

— কেন, আমি যেতে পারি না?

— না, পারিস। হয়তো। আর তুই তো ম্যারেড ওয়াইফ। যাবি নাই বা কেন?

— দ্যাটস দ্য পয়েন্ট!

— কী যে বলছিস, তুলু? একটু মাথা ঠান্ডা করে আমাকে বোঝা।

— মাথা আমার খুব ঠান্ডা। নইলে সোহম চট্টোপাধ্যায়ের এই শ্বশুরবাড়ি ভ্রমণের খেলাটা কী করে চলছে এখনও?

— খেলা মানে? ওর কি অন্য কোনও রিলেশনশিপ আছে?

— ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে?

— প্রয়োজন হলে করতে হবে।

— আচ্ছা বউদি, তোমার এখনও মনে হচ্ছে একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আমি তোমার সময় নষ্ট করছি? বিয়ের পর নতুন বরের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে না থেকে কখনও একা কখনও দাদা আর কখনও তোমার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি!

— নিজের বাড়িতে ফিরে এলে বিয়ের পর মেয়েরা নিজের বাড়ির মানুষের সঙ্গে একটু বেশিই সময় কাটায়। আর তোর তো আমাকে ছাড়া চলত নাা একদিনও। তাই আমাকে আলাদা করে কাউন্ট করিস না। কিন্তু ঘটনাটা কী, সেটা বল।

— এক কথায় বলা যাবে না।

— আমেরিকায় আর একটা বিয়ে-টিয়ে করেনি তো?

— না।

— তবে এখানে অন্য প্রেমিকা আছে। বাড়ির অবাধ্য না হতে পেরে এই বিয়েটা করেছে। কিন্তু এখন তোকে ঠিক স্ত্রী-র জায়গাটা দিতে পারছে না। তাই কি?

— কিছুটা।

— কিছুটা আবার কী?

— মানে, ফিজিক্যালি দিচ্ছে, মেন্ট্যালি না। উল্টোটা বলা যেতে পারে, তাও আমার ডাউট আছে।

— মানে মেন্ট্যালি তোকে অ্যাকসেপ্ট করছে, কিন্তু ফিজিক্যালি ক্লোজনেস ফিল করছে না!

— মেন্ট্যালি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করার ভান করছে সবার সামনে। আর আমাকে বলছে টাইম দিতে।

— আর ফিজিক্যালিটি নিয়ে কী বক্তব্য তার? মানে কথা হয়েছে তোর সঙ্গে?

ক্রমশ পরমার আওয়াজ অধৈর্য হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছোয় যে সুনন্দ ভেজানো দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখে। তুলু বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে জানালার বাইরে থেকে আসা রোদের টুকরো গালে মেখে। রোদের ঝলকে নাকি ত্বকের ঔজ্জ্বল্যে কেমন একটা চকচকে ভাব যেন। নাকি চোখের জল গড়িয়ে নেমেছে তীক্ষ্ণ নাকের দেওয়াল ঘেঁষে! সবটা বুঝতেই সুনন্দ যেন আরও একটু বেশি করে শরীরটা সেঁধিয়ে দিতে চায় ঘরের ভিতর। পরমা বলে ওঠে, 'তুমি প্লিজ একটু পরে এসো। আমাদের কিছু কথা আছে।'

— ইনফ্যাক্ট আমি ওই কথাই জানতে চাইছি। হোয়াটস দ্য প্রবলেম উইথ তুলু?

সুনন্দ যেন ভিতরে ভিতরে ভাঙতে শুরু করেছে এত ছোট একমাত্র বোনের বিবাহিত জীবনের কোনও আশঙ্কার আঁচ পেতে পেতে। পরমা যেন ছড়িয়ে রাখা লুডোর কোর্ট আর ঘুঁটি গুছিয়ে তুলবে এমন ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'তুমি সোহমকে নিয়ে নীচে যাও। আমি এখুনি আসছি। লাঞ্চ সার্ভ করছি।'

'বাঃ! সব করো। যেমন হওয়ার কথা। ঠিক তেমনই হোক সব...' তুলুর বাক্যের শ্লেষটুকুকে যেন হঠাৎ ভয় করে পরমার। একেবারে কাছে সরে আসে সে ওর। তুলুর হাঁটুর ওপর থেকে ঝুলে থাকা হাতের পাতাদুটির ওপর নিজের আঙুলগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করে পরমা যেন একলা হাতদুটি সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিতে চায় সে তুলুর বসে থাকার রুক্ষতাটাকে সারিয়ে দেবে বলে। একটা ঝুরো চুড়ি টেনে নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেয় আনমনে। নীচের দিকে নেমে আসা চুড়িটা দ্বিতীয় চুড়িটির গায়ে গড়িয়ে এসে সুন্দর একটা ঝিন করে আওয়াজ তোলে। দু'জনেই এক সঙ্গে আজ শুধু শোনে না, যেন দেখতেও পায় সোনালি সেই শব্দ। নরম একটা হাসি ভাগাভাগি করে নিতে নিতে বিছানার থেকে নেমে পড়ে দু'জনই। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তুলু অগোছালো চুলগুলোকে কিছুটা বাধ্য করে তুলতে চায়। পরমা ওর খোলা চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিলে হঠাৎ সে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে জাপটে ধরে বউদিকে। পরমা টের পায় একটা থামিয়ে রাখা তুফানের। ব্যথা পায় তুলুর শরীরের চাপ সহ্য করতে করতে। শুধু বলে, 'খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে এসে তুই আর আমি আবার আমাদের সেশনে ফিরে যাব।

— কিন্তু আমি তো আর ফিরে যাব না।

— কোথায়?

— সোহমের সঙ্গে।

— ঠিক আছে। তার আগে সব কথাগুলো তো শুনতে হবে। তেমন হলে, তুই যা চাইবি তাই হবে।

খাওয়ার টেবিলে মা যতই পিঠে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াক না কেন, তুলু একবগ্গা। চিংড়ি-মালাইকারি ছাড়া আর কিছু প্লেটেও নেবে না। ছোটমণি কিছুক্ষণ 'মণি'-'সোনা' এ সব বলে কয়ে দেখেছে। কিন্তু কেমন যেন রুক্ষ হয়ে আছে ও। মা আবার এ সব সময় কেমন ভয় পায় ওকে। ইশারায় পরমাকে বলে সব দেখেশুনে নিতে। ঋতম জানিয়েছে ও সন্ধের আগে ফিরতে পারছে না। সোহম কেমন যেন এই ছেলেটা-ভেলভেলেটা হয়ে ঘাড় নিচু করে খাবারগুলো মুখের ভিতর চালান করে দেওয়ার ব্যায়াম করতে থাকে। সমস্ত টেস্টবাড যেন অ্যান্টিবায়োটিকের তাড়নায় খসখসে হয়ে গেছে ওর। ডাল আর এঁচোড়ের কোফতা যে আলাদা টেস্টের তা যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না এখন। অথচ ও খাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে বেশ ভালোবাসে। প্রতিটি ভালো রান্নার রেসিপি নিয়ে আগ্রহ দেখায়, আবার নতুন কিছু সাজেস্টও করে। পরমা মাঝে মাঝে চেষ্টাকৃত হাসিটিকে লিপলক করে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কিন্তু ততবারই সোহমকে জলের গ্লাস তুলে নিতে দেখা যায় অনাবশ্যক তেষ্টায়। মাঝে দু-একবার তুলুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টিটাকে চালান করে দেয় সে ছাদ ছুড়ে একেবারে আকাশে। কিংবা আরও দূর কোনও দেশে। তুলুর হঠাৎ মনে হয়—আচ্ছা, ও কি সেই তথাকথিত প্রেমিক যুগলের মতো ঠিক এই সময়ে আকাঙ্ক্ষা করছে যে গ্যারি এসে পড়লে দারুণ হত! কারণ ও তো খেয়াল করেছে গ্যারির কথা বলতে গেলে সোহমের কোনও সংকোচ কাজ করে না। সব যেন এমনই হওয়ার কথা ছিল। তাই, এই মুহূর্তে সোহম ঠিক কী ভাবতে পারে তা ভেবে নেওয়ার খেলায় যেন ও ঢুকে পড়তে চায়।

কিন্তু আশ্চর্য হয় নিজেই, যখন সোহম আর গ্যারির যুগল ছবিগুলোর কথা সামনে এসে পড়ার কথা ছিল, ঠিক সে সময় তুলুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় লুকিয়ে দেখা 'অ্যান ইংলিশ অগাস্ট' ছবির সেই দৃশ্যটা। আসলে সেটাই ছিল ওর প্রথম দেখা মেল ন্যুড। শুধু ন্যুডিটি নয়, পুরুষের স্ব-মৈথুনের দৃশ্যও সেই প্রথম দেখা। তারপর বেশ কয়েকবার বউদির সঙ্গে আর দু'বার ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে নিজের ঘরে নীল ছবি দেখেও তেমন যেন ভালো লাগেনি তুলুর। কেমন যেন বানানো ব্যাপার-স্যাপার। কেমন যেন করতে হবে বলে করা! যেন তাবৎ পৃথিবীতেও বাকি সব কাজের কোনও দাম নেই, শরীর-শরীর খেলা ছাড়া। কিন্তু এখনও ওর চোখের সামনে সেই অগস্ত্যরূপী রাহুল বোসের শরীরি কাঠামো নগ্ন পুরুষ শরীরের উদাহরণ মাত্র যেন। যেন রাতে শুয়ে শুয়ে ও আজও ফ্যান্টাইসাইজ করতে হলে ফিরে যাবে ওই ছায়াছবির ক্যারেকটারের কাছেই। অবশ্য পরে রাহুল বোসের আরও অনেক ছবিই দেখেছে ও। কিন্তু অগস্ত্যকে ভুলতে পারেনি কিছুতেই। বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর, যতবার নিজের সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ভেবেছে ততবার ওই নগ্ন অগস্ত্যর শরীরের চাপে গলে যাওয়ার কথা মনে পড়েছে ওর। অগস্ত্যর চোখের ক্রূরতা আর পেশীর কাঠিন্য যেন টের পেয়েছে ও রাতের অন্ধকারে একলা ঘরে, সোহম নামক দূরদেশী পাত্রটির কথা কানে শোনার পর থেকেই। কিন্তু প্রথমবার চোখে দেখেই তুলু সোহমকে অনেক বেশি নম্বর দিয়ে ফেলেছে অগস্ত্যর তুলনায়। সোহমের চেহারার বাইরের গঠন আর কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতায় বারবার মনে হয়েছে—এই পুরুষের শরীরে মিশে যেতে কোনও ক্ষোভ থাকবে না তার। ❖

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

অলঙ্করণ : তাপস মণ্ডল

নেশাভাঙের দে দোল দোল

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

এরই সঙ্কেত যেন পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলের লাঠমার হোলির উৎসবে। যেখানে ভিন গাঁ থেকে রং খেলতে আসা পুরুষদের ধরতে পারলে মেয়েরা দস্তুরমতো বেধে পেটায়। রং দিয়ে যে ভূত করে তা বলাই বাহুল্য। শেষতক সেই সব ধরা পড়া পুরুষদের ঘাগরা-চোলি পরিয়ে দেয়।

বসন্তের বর্ণময় পরিচয়ের ঠিকানা হল দোল। পাঠক, আর মাত্র দু'দিন পরে চিত্র-বিচিত্র রঙে সেজে উঠবে কোথাও দোলযাত্রা, কোথাও হোলি, কোথাও আবার বসন্ত উৎসব। এরও আবার রকমফের আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধরন-ধারণ। কম বয়সেই শুনেছিলাম এই দোল উৎসবের প্রত্যন্তে আছে কৃষ্ণপ্রেমের আভাস। আরও পরে জানতে পারি কামদেবতা মদনের মহোৎসবের ছায়া থেকে গেছে এই রঙের উৎসবে। শীতের শেষে বসন্তে প্রকৃতি পুর্নজীবিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে যৌবনও নতুন করে বিকশিত হয়। আর কামদেবের প্রিয় সখা এই বসন্তকাল। তাঁর হাতে বসন্তেরই তুলে দেওয়া

অস্ত্রশস্ত্র। ধনুকটি হল পুষ্পনির্মিত। যার ছিলা হচ্ছে ভ্রমর ও মধুকরেরা। তার তূণে আছে পাঁচটি তীর— অশোক, আম্রমুকুল, মল্লিকা, শ্বেতপদ্ম, নীলকমল। সংস্কৃত সাহিত্যের পাতা ওল্টালে এই মদনমহোৎসবের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, এ হল যৌনমিলনের সমানাধিকারের উৎসব। রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা পড়লে মনে হয় এই উৎসবে পুরোনো মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার চিহ্নগুলি থেকে গেছে। যেখানে নারী একজন পুরুষের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। বরং সে স্বাধীন ভর্তৃকা যাকে ইচ্ছা সে বরণ করতে পারে। এরই সঙ্কেত যেন পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলের লাঠমার হোলির উৎসবে। যেখানে ভিন গাঁ থেকে রং খেলতে আসা পুরুষদের ধরতে পারলে মেয়েরা দস্তুরমতো বেধে পেটায়। রং দিয়ে যে ভূত করে তা বলাই বাহুল্য। শেষতক সেই সব ধরা পড়া পুরুষদের ঘাগরা-চোলি পরিয়ে দেয়। অন্যদিকে হরিয়ানায় প্রচলন আছে হোলির দিন বউদিরা দেওরকে ধরে পেটাতে পারে। এই সমানাধিকার ও প্রেমজ উৎসব ক্রমে এক যুদ্ধের চেহারা নিয়ে নেয়। যেখানে দু'পক্ষই সমান-সমান। তথাপি মেয়েরাই বেশি ভারে কাটে।

সে যাই হোক, বাংলার দোলে তেমন যুদ্ধংদেহি চেহারা না থাকলেও একটা অন্য অধিকার সাব্যস্ত করার ভাব ছিল, আজও আছে। ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় কৈশোরেই দোলপূর্ণিমার রং আমার মনে ধরেছিল। বর্ণচোরা মনে সেই সময়েই যেন যৌনতার আঁচ পেয়েছিলাম। যে মেয়েটিকে মনে মনে পেতে চেয়েছি দোলই বোধ হয় একটা অবকাশ তৈরি করে দিত—তাকে ছোঁয়ার,

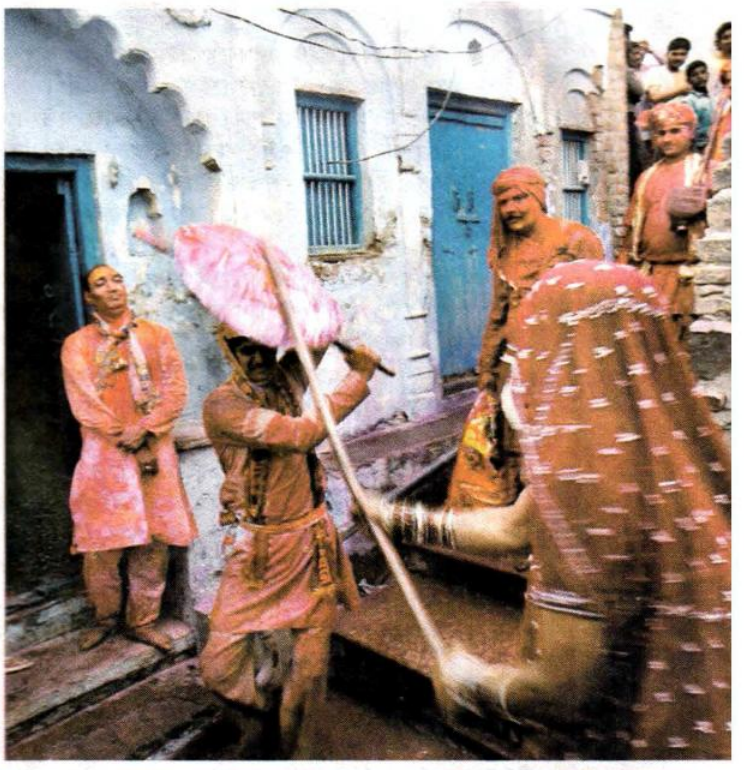

রং মাখানোর দোহাইয়ে স্তন ছুঁয়ে যাওয়ার, সামান্য হলেও কাছে পাওয়ার। এর মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। শুধু বছরভর অপেক্ষা আছে। দোল হল সেই দরজা খোলার উৎসব। এরপর বয়স উড়ে গেল। আর সেখানে স্থান পেল নেশা। যৌবনের উৎসবে তো নেশার আসন পাতা থাকবেই। ছিলও তাই। সেই সাতসকালেই গুচ্ছের নেশাভাঙ আর তাল-বেতালের গান। রং দেওয়া, রং মাখা উপলক্ষ মাত্র। আসল লক্ষ্য হল দোলের নেশায় দে দোল দোল।

উৎসবের সঙ্গে নেশার একটা যোগ আছে। আর সে যদি হয় অবাধ যৌন মেলামেশার উৎসব। তবে সমগ্র উত্তর ভারতে হোলির সঙ্গে সিদ্ধি-ভাঙ বা ঠান্ডাই কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল তা আমার আজও অজানা থেকে গেছে। কেননা ভাঙ তো হল শিবঠাকুরের প্রিয় নেশা। তা কীভাবে হোলিতে আছড়ে পড়ল? কে জানে! আজ সেই নেশায় পূর্বভারতও নেচে উঠেছে। ভাঙ এখানে কনভার্টেড টু বাংলা-রাম-হুইস্কি-বিয়ারে। কিন্তু আছে, নেশা আছে ভরপুর। এমন কী রবি ঠাকুরের সমীচীন সাংস্কৃতিক উৎসবেও নেশা ঢুকে পড়েছে। একাধিকবার আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বসন্ত উৎসবের সময় বোলপুর-শান্তিনিকেতন জুড়ে মদের হাহাকার। লোকে বলছে, 'কলকাতার বাবুরা সব কিনে লিয়েছে।' ফলে হয় সিউড়ি ছোটো নয়তো ইলামবাজার। মদ জোগাড় করতেই হবে। কবিগুরুর বসন্ত উৎসব। কলকাত্তাইয়াদের নেশা ছাড়া চলবে?

কিন্তু এই পোশাকি নেশার বাইরেও বসন্তের এই পূর্ণিমাতে ভাঙের চিরাচরিত নেশার অবগাহন আছে। ওই যে বলছিলাম, পুরো উত্তর ভারত জুড়ে আছে এই সংস্কৃতি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভাঙের সরবত পান করছে। নানা তরিজুত করে এই সরবত বা ঠান্ডাই বানানো হয়। ভাঙের পাতা আর ফুল হামানদিস্তায় ছেঁচে তাতে দুধ আর বাদাম বাটা দিয়ে মধু দিতে হবে— মধু না পেলে চিনিও চলবে। এর সঙ্গে সামান্য গরম মশলা (দারচিনি ও এলাচ) ও সামান্য পরিমাণ আদা মেশালে ঠান্ডাই জমে যায়। কেউ কেউ তাতে খানিকটা গোলাপজলও দেয়। হোলির আগের দিন রাতভর চলবে এই ভাঙের সরবত তৈরির প্রস্তুতি। কোথাও কোথাও দেখেছি এই ঠান্ডাইয়ের মধ্যে পোস্ত বেটে দিতে। বলা হয় এই ঠান্ডাই যদি তামার পাত্রে তৈরি করা হয় তবে নেশার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আর যদি তামার পাত্র যোগাড় না-ও করা যায় তারও উপায় আছে। সেক্ষেত্রে তামার পয়সা বা তামার বালা ঘষে দেওয়া যেতে পারে। বেনারসের অদূরে রামপুরে আমি বিশ-পঁচিশজন মহিলাকে অকাতর যৌন ছন্দে সারা রাত ভাঙ বাটতে দেখেছি। হোলির আগে থেকেই শুরু হয় নেশা ও যৌনতার একটা আবহ। যা চলতে থাকে দু'দিন

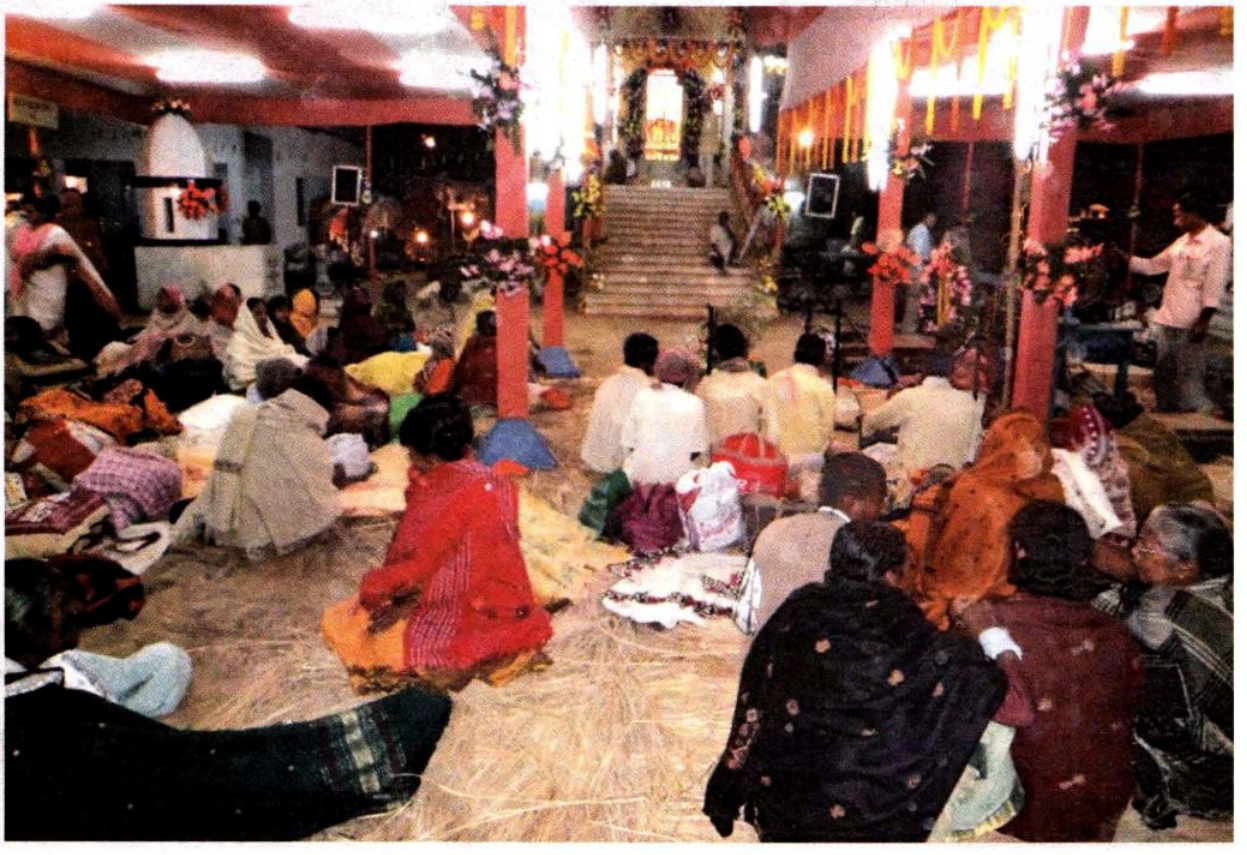

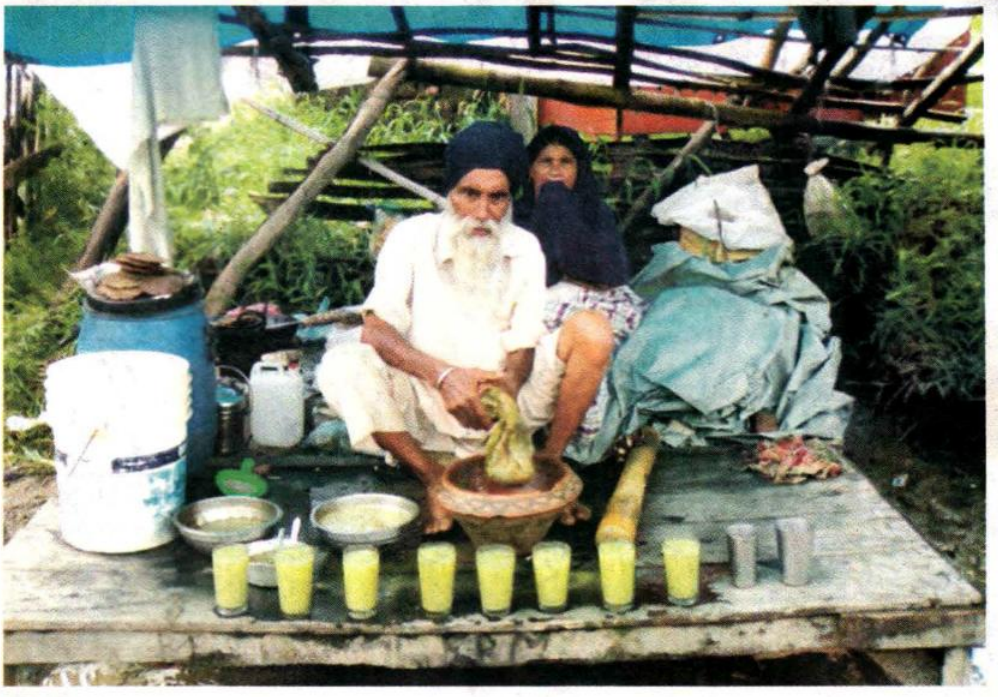

উৎসবের সঙ্গে নেশার একটা যোগ আছে। আর সে যদি হয় অবাধ যৌন মেলামেশার উৎসব। তবে সমগ্র উত্তর ভারতে হোলির সঙ্গে সিদ্ধি-ভাঙ বা ঠান্ডাই কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল তা আমার আজও অজানা থেকে গেছে।

থেকে তিন দিন। কোথাও কোথাও চারদিন পর্যন্ত চলে। রং খেলা আছে, তবে তা অনেকটাই যৌন আবর্তে চলে। এমন বহু হোলিতে উত্তর ভারতে থেকে দেখেছি যে ছেলেরা কপাল- মাথা মুখে রং ঘষে ক্রমে মহিলাদের স্তনে রং মাখায়, এটা সম্পূর্ণত হোলির দস্তুর। যেভাবে মেয়েরা ছেলেদের নিম্নাঙ্গ তাক করে থাকে। পিচকারি আছে, গোলা রং আছে। কিন্তু ফাগ বা আবির, হাতে মাখা রঙেরই জোর বেশি। জোর বেশি শরীরে শরীর মিশিয়ে রং খেলার।

বাংলার রং-এর উৎসব দোল আবার সেজেছে ভিন্ন সাজে। জেলা থেকে জেলায় তার কথাটি বদলে গেছে। শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথির কারণে এখানে দোলপূর্ণিমা কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে প্রেমরসের ভিয়ানে। বৈষ্ণব সমাজ এই দোলকে নির্দিষ্ট করেছে এক অন্য রসের রসায়নে। সেখানেও নেশা আছে। প্রেমরসের নেশা, অবাধ মেলামেশার নেশা আর বাউলরা ইত্যাবসরে গাঁজায় দম মারছে। সেও তো ওই ভাঙেরই প্রকারান্তর। সঙ্গে চলেছে প্রেম নাম। প্রেম গান। নদিয়া জেলায় এর দাপট বেশি হলেও বর্ধমান- বীরভূম কম যায় না। এই দোল উপলক্ষে বৈষ্ণব সমাজ আয়োজন করে নানা মেলার। ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা যেমন কর্তাভজারা তৈরি করেছে তেমনই আছে অসংখ্য ছোট ছোট মেলা। শোনা যায় চৈতন্যদেব নিজে প্রথম রং দিতেন শ্রীকৃষ্ণকে, তারপর তাঁর ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে রঙের খেলায় মাততেন। এই খেলার আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকত মালপোয়া। ধরে নেওয়া যায় সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ানো চৈতন্যদেব উত্তরভারতের হোলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু নিজের সমাজে এই দোলকে তিনি সম্পূর্ণত অন্য রঙে রাঙিয়েছিলেন।

শেষ করব এই দোল উৎসবের একটি ছোট মেলা দিয়ে। কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ড গ্রামের দোল মেলা। ছোটো কিন্তু প্রাচীন। শ্রীখণ্ড গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের পরিচয় দেয় খণ্ডবাসী বলে। এই গ্রামের বৈষ্ণব ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইতিহাস গড়ে উঠেছে। স্বয়ং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই গ্রামে এসেছিলেন। প্রখ্যাত বৈষ্ণব নরহরি সরকারের জন্মস্থান এই শ্রীখণ্ড গ্রাম। রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীরও মিলনস্থল এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম। কবি শ্রীলোচন দাস এই গ্রামেই বসে রচনা করেন 'চৈতন্যমঙ্গল কাব্য'। এখনও তিনটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলিকে ঘিরেই মেলার আয়োজন। এই মন্দিরগুলি যথাক্রমে শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন মন্দির, শ্রীশ্রী রাধা মদনগোপাল মন্দির ও অন্যটি রাধাগোবিন্দ মন্দির। বৈষ্ণব সমাজের কাছে এটি একটি শ্রীক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। সকাল থেকে নাম সংকীর্তন হয়। মেলার মেজাজে বৈষ্ণব ভাব থাকলেও অন্য বড় বড় মেলার থেকে পৃথক করা যায় না। দিনভর ভক্তজনেরা উৎসব পালন করে। ভোগ সেবা দেওয়া হয়। এমনিতেই কাটোয়ার মিষ্টির নামডাক আছে। তায় আবার মালপোয়া। এই মেলার আয়োজন করে শ্রীখণ্ড মধুমতি সমিতি। আয়োজনে সাত্ত্বিকভাবটি লক্ষ করার মতো। এই ঠাকুর বাড়িগুলিতে প্রাচীন অঙ্গের কীর্তন শোনা যায়। এখানে নেশার তেমন প্রাবল্য নেই। কিন্তু দোলযাত্রা উৎসবের পূর্ণতায় এই মেলা মেতে ওঠে।

আপাতত সামনের দোলের অপেক্ষায়। ❖

ছবি: লেখক

আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
চোখ বুজে আন্দাজে খপ করে ধরলাম একজনকে
হিঃ হিঃ চলো এবার। আজকে রাতে আমি তোমার প্রিয়া।
সবাই হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়ল।
সুন্দরী আমার হাত ধরে নিয়ে গেল তার শয্যায়।
সারারাত ধরে সে আমাকে সুখ সাগরে ডুবিয়ে রাখল। চল্লিশবার পান করাল তার অমৃত।
এই দেওয়া নেওয়ার পালা চলল রাতভোর।

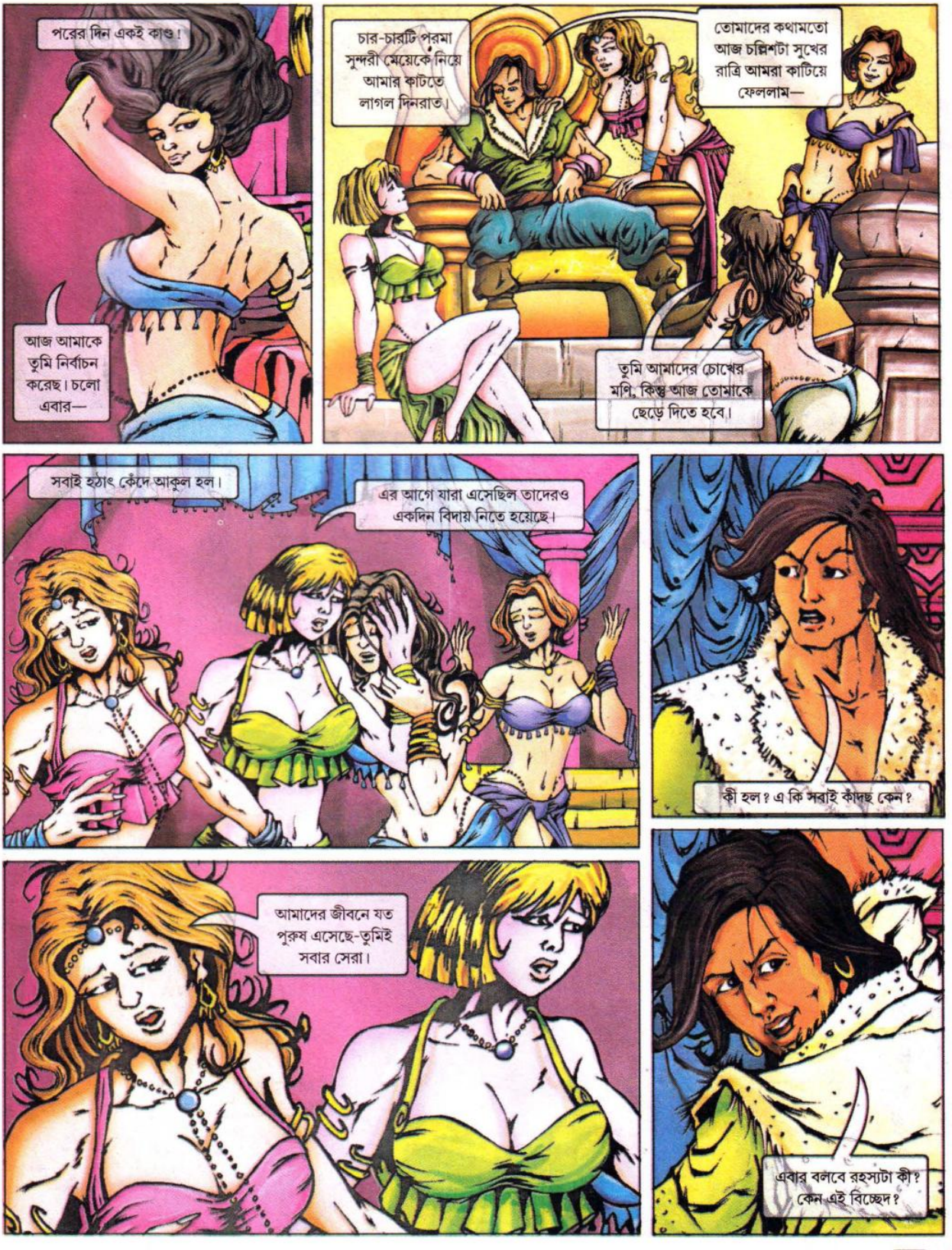
পরের দিন একই কাণ্ড!
আজ আমাকে তুমি নির্বাচন করেছ। চলো এবার—
চার-চারটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আমার কাটতে লাগল দিনরাত।
তোমাদের কথামতো আজ চল্লিশটা সুখের রাত্রি আমরা কাটিয়ে ফেললাম—
তুমি আমাদের চোখের মণি, কিন্তু আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।
সবাই হঠাৎ কেঁদে আকুল হল।
এর আগে যারা এসেছিল তাদেরও একদিন বিদায় নিতে হয়েছে।
কী হল? এ কি সবাই কাঁদছ কেন?
আমাদের জীবনে যত পুরুষ এসেছে-তুমিই সবার সেরা।
এবার বলবে রহস্যটা কী? কেন এই বিচ্ছেদ?

চলবে

রূপসী
বাংলা
খুশি মন সারাক্ষণ
SENCO GOLD
Presents
রূপসী
বাংলা
অপরাজিতা
২০১৩
Powered By
মাতৃভূমি
প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
শুক্র-শনি
রাত ১০:৩০
www.ruposhibangla.in
Partners
LEAVES N BUD TEA
শালিমার
নারকোল তেল
KINNOVA
Kitchen innovation at its best
AMEZ TEA
A brand owned by ASPEN GROUP
MAXbe green provision
Parivar
REAL ESTATE • ENTERTAINMENT • HOSPITALITY
এক অটুট পারিবারিক বন্ধন
Print Partner
খবর ৩৬৫ দিন
News Channel Partner
NEWS TIME
Music Channel Partner
DHOOM
রূপসী বাংলা দেখার জন্য
যোগাযোগ করুন
আপনার কেবল অপারেটরের সঙ্গে
TATA Sky
Channel No 860
dishtv
Channel No 837
VIDEOCON d2h
Digital DTH Service
Channel No 710
airtel digital TV
Channel No 548

Cadbury Bourn Vita
Presents
ফ্রান্সিস
হীরের পাহাড়
রূপসী বাংলা
খুশি মন সারাক্ষণ
রবিবার সকাল ১০:৩০
শনিবার রাত ৯:০০
www.ruposhibangla.in
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরের খোঁজে এবার ফ্রান্সিসের ভয়ংকর আফ্রিকা-অভিযান।
নরখাদক বন্য উপজাতি, হিংস্র আফ্রিকান সিংহ আর ভয়াল অ্যানাকোন্ডা সাপের সঙ্গে
লড়ে ফ্রান্সিস কি পাবে সেই গুপ্তধনের খোঁজ ?
রূপসী বাংলা দেখার জন্য
যোগাযোগ করুন
আপনার কেবল অপারেটরের সঙ্গে
TATA Sky
Channel No 847
dishtv
Channel No 837
VIDEOCON d2h
Channel No 710
airtel digital TV
Channel No 548

JMD Infotel Private Limited
90 A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata – 26. Ph – 033-40636307, 9874155555.
For Trade Enquiry contact – info@jmdmobile.in
For Service Enquiry contact – support@jmdmobile.in

ANINDITA ENTERPRICE BANSDRONI **91430486300** • **OSIYA COMMUNICATION** COOCHBEHAR **7501475255** • **CHAYA COMMUNICATION** ALIPURDUAR JN.**9126219658** • **TARA PRADHAN** SIKKIM **9734914817** • **RAJ & RAJ OPTICO WITH TELECOM** MAYAPORE (HOOGHLY) **9333268525** • **MOBILE REPAIRING CENTRE** JHARGRAM **9932419146/9851699199** • **RONIT TELELINK** KESHIYARI(MIDNAPUR) **8967228360/9932413580** • **N C TRADERS** BHATER BURDWAN **9732116727/9434002790** • **SARASWATI TELECOM** ANANDAPUR(MIDNAPUR) **8436148966/9046267464** • **MUKHERJEE TELECOM** SRIPALLI BURDWAN **9333931806** • **MIZAN MOBILE** MURARAI **9732214299** • **NEW COMPUTER WORLD** RAMNAGAR **9434341081/9732830492** • **ANULIPI** BUDGE BUDGE **94338024225** • **SA ELECTRONICS** UTTARPARA **9831068549** • **SHREE KRISHNA INFOTECHCENTRAL** KOLKATA **9831520111/9831826050** • **SUBH TELECOM** SINGUR **9883477655** • **TAPAS ENTERPRISE** CHAPPRA **9153631435** • **TARA MAA ENTERPRISE** ARAMBAGH **9732468105/9775793169/9800292192** • **SHYAMA PRASAD HATI(HUF)** BANKURA **9153418776** • **ASHIRBAD** BEROHI **96092857761** • **BIKASH ENTERPRISE** BARRACKPORE **9831341908**